ষষ্ঠ অধ্যায়

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাটকে শিল্পমূল্য বিচার

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাদ্বয়ে রচিত নাটকগুলির শিল্পমূল্য বিচার নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। তাই এই দুই জেলার মৌলিক নাট্যসৃষ্টির শিল্পমূল্য বা সাহিত্যমূল্য বিচার প্রসঙ্গে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ নির্ভর বিশ্লেষণ অতি আবশ্যক। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চার সূত্র ধরে এতদ্‌ঞ্চলের নাট্যকাররা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে মৌলিক নাটক সৃজন করেছেন, যা জেলাসহ সমগ্র বাংলা জুড়ে স্বমহিমায় বিরাজমান। এবং তাঁদের কিছু রূপান্তরিত এবং অনুবাদিত নাটকও বাংলাব্যাপী খ্যাতি ও সম্মানে ভূষিত হয়েছে। সে কারণে আলোচ্য অধ্যায়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাদ্বয়ে সংগৃহীত নাটকগুলির মধ্যে প্রকাশিত এবং কিছু মঞ্চসফল পাণ্ডুলিপি নাটকের শিল্পমূল্য (সাহিত্যমূল্য) নিরূপণের জন্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করছি।

উত্তরদিনাজপুর জেলায় রচিত নাটকের শিল্পমূল্য (সাহিত্যমূল্য) বিচার:

নাট্যকার ডা: বৃন্দাবন বাগচী রচিত 'এক ডোরে বাঁধা' নামে সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটকটি মোট ৯টি দৃশ্য সংখ্যা নিয়ে পরিবৃত হয়ে আছে। ১৬টি চরিত্র নিয়ে এই নাটকের নাট্যমুহূর্তগুলি মঞ্চায়িত। শঙ্করণ চরিত্রটি প্রধান চরিত্র, কেতন সহ প্রধান চরিত্র, বিলাওল প্রধান প্রতি পার্শ্বচরিত্র, ফাল্গুনী, রামভগত, কিষেণচাঁদ, মুস্তাফা, নরেশ্বর, বুড়া, সলিমুল্লা, যন্মুখ্‌ম, কোহিনূর, সুলতানা প্রভৃতি চরিত্র সহকারী চরিত্রের ভূমিকায় চিত্রিত এবং মৌলভী, দুজন গুণ্ডা অপ্রধান চরিত্রের ভূমিকায় চিত্রিত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিসত্তা ও সম্প্রদায়ের মানুষ সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের প্রাচীর ছিন্ন করে, নানা ধরনের ভিন্নতা থেকে বেরিয়ে এসে সকলে সমবেত হয়ে শাশ্বত ভাবগত সংহতি ও সম্প্রদায়গত সম্প্রীতির (Communal Hermony) জয়গানে মুখরিত হয়ে ভারতের চিরায়ত বা সনাতন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তোলাই আলোচ্য নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়।

নাটকটির প্রতিটি চরিত্রই কেন্দ্রীয় ভাব বা Idea-র সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর ফলে প্রতিটি চরিত্র নাটকের দৃশ্যের প্রয়োজনে কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তবে মৌলভী, তেওয়ারী বিলাওল, ফয়জল, বসির, বদরী, সুখন্দর কয়েকটি নাট্যচরিত্র রূপে সার্থক হয়ে উঠেছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে প্রধান চরিত্র, সহ প্রধান চরিত্র এবং অন্যান্য চরিত্রগুলি নাট্যচরিত্র সম্মত হতে পারেনি। আলোচ্য নাটকে মৌলভী, তেওয়ারী, বদরী, বসির, সুখন্দর প্রভৃতি চরিত্র নিখুঁত শ্রেণী চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অপরদিকে বিলাওল, ফয়জল-এই দুই চরিত্রের মধে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাত প্রকটরূপে ফুটে উঠেছে এবং এর পরিণামে চরিত্রগুলির মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব-জটিল বাতাবরণ সূচিত

হয়েছে। ফলস্বরূপ দেখা যায় এই দুটি চরিত্র তুলনামূলকভাবে অন্যান্য চরিত্রগুলি থেকে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

নাটকটি শাশ্বত মানবিক আবেদনে পরিপূর্ণ এবং নাটকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও সুসংহত নাট্যবন্ধন তৈরি করতে সম্মত হয়েছে। সেই সঙ্গে চরিত্রগুলি অনেকটা নাট্যসম্মত। এই নাটকটি মঞ্চে অভিনয়ের ক্ষেত্রে উপযোগী। সে কারণে এই নাটকটির সাহিত্যমূল্য অপরিসীম।

ডা: বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী রচিত ঐতিহাসিক পূর্ণাঙ্গ নাটক 'আকাশভরা তারা' ৯টি দৃশ্যে সুবিন্যস্তভাবে পরিবেশিত। মোট ১৪টি চরিত্র, যথা— নাডেজ দা চেকালীনা, আলেকজান্ডার সুভারোভ, আন্দ্রেই অ্যালেক্সি, ভেরা, লিওনিদ, ভার্সিয়া, ভিট্যা, ট্যানিয়া, পেরাকোভ, ব্রাইনিন, চেইকফ, গার্ভরুসা, তওয়ারিশি, প্রেটনিন প্রভৃতি চরিত্র নিয়ে নাট্যমুহূর্ত সংগঠিত।

নাটকটির মুখ্য উপজীব্য বিষয় হল রাশিয়ার সুতীব্র দেশ প্রেমের জোয়ার ও সংহত শক্তি সমস্ত বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করে দেশ-প্রেমের সমহান আদর্শে দেশবাসীকে মুগ্ধ করে এক নজির বিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তুলেছে।

আলোচ্য নাটকে দেশপ্রেমই হল কেন্দ্রীয় ভাব। এবং এই কেন্দ্রীয় ভাব কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভূমিকা যথাপযুক্তভাবে পালন করেছে। এমনকি প্রতিটি চরিত্র সেই কেন্দ্রীয় ভাবেরই প্রতিমূর্ত চরিত্র রূপে নাটকটিতে ফুটে ওঠে। ঘটনার টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে নাটকের প্রতিটি চরিত্র দ্বন্দ্ব— সংকুলময় বাতাবরণের মাঝে জীবন্ত দেশপ্রেমিক চরিত্রের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এই নাটকের আবেদন শাশ্বত এবং ক্রিয়া— প্রতিক্রিয়াও নাট্যরস সৃজনে সার্থক ও পরিপূরক কিন্তু বেশ কিছু চরিত্রের অপরিকল্পিত সংস্থাপন ও সংলাপের দৈর্ঘ্য পরিমিত রস তৈরির ক্ষেত্রে অনেকটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। এই সব অসংগতি জনিত কারণে এই নাটকটির নাট্যকৃতি সাহিত্য ব্যঞ্জনা গৌণ।

নাট্যকার বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচীর লেখা 'কাটা মুণ্ডুরা কথা কয় ও একাঙ্ক গুচ্ছ' নাট্যসংকলন গ্রন্থটি মোট চারটি একাঙ্ক নাটকের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। নাটকগুলি হল— ১. কাটা মুণ্ডুরা কথা কয় ২. জলের তলায় আগুন ৩. সোনার সাহারা ৪. জালনোট। প্রত্যেকটি নাটকে একটি প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে নাটকের ঘটনা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং অন্যান্য চরিত্রগুলি নাট্যপ্রাণতা অর্জন করতে সামর্থ হয়েছে। তবে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল চরিত্র চিত্রণের চেয়ে নাট্য ঘটনাই নাটকগুলিতে প্রাধান্য লাভ করার ফলে মূল ঘটনাকে বয়ে নিয়ে যে কেন্দ্রীয় চরিত্রটি প্রতিষ্ঠিত, সেই চরিত্রটি নাটকের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

'কাটা মুণ্ডুরা কথা কয়' নাটকটির মুখ্য উপজীব্য নুরু মস্তানের মানসিক প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত

গ্লানি তারই খুন করা চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে কিভাবে প্রকাশ লাভ করেছে, তা তুলে ধরা। নাটকটি প্রধান চরিত্র নুরু। নাটকটির অপ্রধান চরিত্র মিত্তির, বগা , সুরেশ, প্রবীর, গণি, পরী, লতিফ, চিলে, বেতকু প্রভৃতি চরিত্র এই কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে আবৃত্ত করে চরিত্রায়িত হয়েছে। নুরু জন্মসূত্রে মস্তান হলেও খুনী নয়। তবে সমাজের সামগ্রিক প্রভাব ও স্খলন নুরুকে খুনী চরিত্র হিসাবে সাজিয়ে তোলে। সেই খুনী 'নুরুর' হাতে তারই স্নেহ-পুষ্ট বগা, সুরেশ, প্রবীর প্রভৃতি সমাজের স্তরের মানুষ খুন হয়েছে এবং প্রত্যেকটি খুনের পিছনে সামাজিক নেতৃত্বের ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। সেই কালো হাতের শিকার হয়েছে নুরু। এর ফলে লক্ষ করা যায় যখন তার নেশা কেটে যায় তখন তার খুনী সত্তা নিভে গিয়ে তার মধ্যে জেগে ওঠে সাধারণ মানুষের মতো স্নেহভরা কোমল ও বিনয়ী সত্তা— এখানে তার অপরাধ বোধের Cathersis ঘটে এবং তার সম্মুখে খুন করা মানুষগুলি ভেসে উঠে তার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করতে থাকে তখন নুরু চরম বিচলিত ও দ্বিধান্বিত বোধ করে এবং বাধ্য হয়ে আবার নেশা পান করে উন্মত্ততায় বুঁদ হয়ে থাকে। এইভাবে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের প্রবাহে নুরু চরিত্রের মধ্যে নাট্যপ্রক্রিয়া জেগে উঠেছে এবং চারিত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে চরিত্রটি জীবন্ত রূপে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

'জলের তলায় আগুন' নাটকটির প্রতিপাদ বিষয়: মানুষের মনোজগতে একান্তে জমাট বেঁধে ওঠা নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ যোগ্যতা সম্পন্ন ভাগ্যের পরিহাসে পঙ্গু বিকল হয়ে পাওয়া না পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতা, এমনকি এই দুয়ের টানাপোড়েনে শেষ পর্যন্ত দ্বেষ-ইর্ষার আগুনে নিঃশেষিত হয়ে নিজের ভিতরে তলিয়ে যাওয়ার বেদনাহত ক্ষোভ। আলোচ্য নাটকটির এই ক্রমবর্ধমান হতাশা ও ব্যর্থতা থেকে উদ্ভুত ক্ষোভের বিকাশমুখর নাট্যপরিস্থিতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র রবির মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে অন্যান্য চরিত্রে রয়েছে জটা, তরুণ, পুষ্পিতা সহ শিশুচরিত্র করবী প্রভৃতি এই কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে আশ্রয় করে প্রতিভাত হয়েছে। পুষ্পিতা ও করবী এই চরিত্র দুটি অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে বাস্তবোচিত ও নিখুঁত রূপে ফুটে উঠেছে। পুষ্পিত ও করবী চরিত্র দুটির মাধ্যমে রবির পঙ্গু বিকল দেহ মনে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা যেমন জেগে উঠেছে, ঠিক তেমনিভাবে না পাওয়ার হতাশাও তার মধ্যে ক্রিয়া করেছে। এর ফলে চরিত্রটি সূক্ষ্ম ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘূর্ণাবর্তের ফলে নিখুঁত জীবন্ত চরিত্ররূপে প্রকটিত হয়েছে।

'সোনার সাহারা' একাঙ্ক নাটকের প্রধান উপজীব্য হল মানুষকে যাবতীয় সম্পদ একায় একায় ভোগ করবার তৃষ্ণা তাকে নিষ্ঠুর ও নির্দয় হিংস্র করে তোলে। এবং পরিণামে পরস্পর কাড়াকাড়ির চেষ্টার মধ্য দিয়ে তৃষ্ণা মেটে না। তাই সম্পদ বন্টনের মাধ্যমে সবাই মিলে ভোগের

মধ্যদিয়েই তৃপ্তি সম্ভব। এই নাটকটিতে লক্ষ করা যায় উদাস চরিত্রটি ঘটনা এবং চরিত্রগুলির মধ্যে সার্থকভাবে কেন্দ্রীয় মেরুকরণ ঘটিয়ে যথার্থ কেন্দ্রয় চরিত্রের ভূমিকায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অন্যান্য চরিত্র লোভেশ, কেঁদো, ইবলিশ, দোজো, উল্‌ফ্‌ প্রভৃতি চরিত্র কেন্দ্রীয় চরিত্রকে আশ্রয় করে ফুটে উঠেছে। তবে এই চরিত্রগুলি একই উদ্দেশ্যে অভিমুখে নির্দিষ্ট এবং নাটকটিতে সীমায়িত চরিত্রগুলি নির্দেশের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেনি। একটি অবক্ষয়িত সমাজের প্রতীক চিত্র হল 'সাহারা'। তাই এই 'সাহারা'র মতো চিরন্তন অবক্ষয় মথিত সমাজের বুকে প্রত্যেকটি মানব সত্তা সোনার অর্থাৎ বাঁচার প্রয়োজনে ছোটাছুটি করে। এই ছুটে চলা থেকে কেউই বিরত থাকে না— সাধু থেকে আরম্ভ করে ছিঁচকে চোর পর্যন্ত। প্রত্যেকটি মানুষ যেমন করে নিজেকে লোভের বিষচক্রে জড়িয়ে ফেলে ঠিক এই নাটকেও প্রভাত সর্দারের মধ্যে সেই একই বাসনার কথা ধ্বনিত হয়েছে— ''আঃ আমার সোনা— আমার সোনেকা চিড়িয়া— আঃ আমার— সো-না।'' নাটকটি রূপকধর্মী হলেও রূপকের আড়ালে যে আভাস ব্যঞ্জিত হয়েছে, তা সহজ ও বোধগম্য। সেক্ষেত্রে নাটকটির আবেদন সার্বজনীন মানবিক হয়ে উঠেছে।

'জালনোট' একাঙ্ক নাটকে সমাজের সামগ্রিক স্খলনের চিত্র যেমন করে ফুটে উঠেছে, বিপরীত দিকে আলোর পথে উত্তরণের তাৎপর্যবাহী ইঙ্গিত পরিস্ফুটিত হয়েছে। এই নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হল রত্ন মজুমদার। অন্যান্য অপ্রধান চরিত্র বিপ্রদাস, ফণী, উত্তম, তপু, ওসমান, অতীন, রামসিংহ প্রভৃতি। এই চরিত্রগুলি কেন্দ্রীয় চরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। শিখা চরিত্রটি আলোচ্য নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রধান পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে চিত্রিত। এবং এই শিল্পীর রূপকে কেন্দ্রীয় চরিত্র রত্ন লোভের লালসায় মত্ত হয়ে জাল নোটের জাল চক্র ছড়ায়। এমনকি এই নকল অর্থকরী শিল্পের পরিপূরক চরিত্রের ভূমিকায় স্ত্রী শিখাও যথেষ্ট কাজ করেছে। নাটকটির চরিত্রগুলি বাস্তব ও নিখুঁত। তবে বিশেষ করে এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও পার্শ্ব চরিত্র— রত্ন ও শিখা নাট্যকারের নাট্যদক্ষতার গুণে বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র রূপে ফুটে উঠেছে।

ডা: বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী রচিত এই চারটি সামাজিক নাটক সার্বিকভাবে একাঙ্ক নাটকে আদর্শ বহন করেছে এবং সেই সঙ্গে প্রতিটি নাটকের নাট্যবিষয় মূলত চিরন্তন আবেদনে মুখরিত। যেহেতু এই নাটকগুলির সাহিত্যমূল অনস্বীকার্য।

'গোধূলী' এই সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটকটির মূল গল্প: 'গোধূলী'— পরিতোষচন্দ্র গুহ, নাট্যরূপ: আশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশনায়— 'গ্রুপথিয়েটার পত্রিকা, ৩৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ: ৭৩, প্রকাশকাল— মে-জুলাই ২০১৫ খ্রি:।

৯টি দৃশ্যে নাটকটি সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপিত। নাটকে চরিত্রগুলি: গোধূলী, হরো, বিছানু, কর্মকার,

অতুল, হৃষিকেশ, রূপচাঁদ, বলদেব, সদানন্দ, পচমা, হিমানী, ডাক্তার, ১ম গ্রামবাসী, ২য় গ্রামবাসী, ৩য় গ্রামবাসী প্রভৃতি। এদের মধ্যে গোধূলী চরিত্রটি কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই কেন্দ্রীয় চরিত্রটির মধ্যে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নাট্যক্রিয়ার দ্বন্দ্ব সংঘাত যথেষ্ট সক্রিয়। কেন্দ্রীয় চরিত্র গোধূলীকে কেন্দ্র করে অন্যান্য চরিত্রগুলি প্রকটিত হয়ে উঠেছে।

নাটকটির মূল্য উপজীব্য: শ্রীমতি (ছিরামতি) নদীর উপর সেতু নির্মাণের (Construction)-এর কাজকে কেন্দ্র করে উক্ত অঞ্চলের অসহায় সাধারণ মানুষেরা কোন উপায় না পেয়ে শ্রমিক পেশায় যুক্ত হয়। অর্থাৎ তারা রেজিন বা দিনমজুরীর কাজে যুক্ত হওয়ার ফলে তাদের দৈনন্দিন অভাবে তাড়িত অসহায়তার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং নানাবিধ অবৈধ পথে ঠিকাদারের কাছে এই সব সাধারণ মানুষ নির্মমভাবে শোষিত হয় তার বাস্তবোচিত জীবন্ত চিত্র নাটকটিতে পরিস্ফুটিত হয়েছে।

নাটকটির মূল বা কেন্দ্রীয় চরিত্র গোধূলী একদিকে সংসারের দৈনন্দিন অভাবের তাড়নায় জর্জরিত হয়ে রেজিন তথা দিনমজুরীর কাজ করে সংসার চালায়। অপরদিকে অসুস্থ স্বামী হরোর সুস্থ থাকার জন্য ঔষধ ক্রয়ের কথা মাথায় রেখে স্বামীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও নারী শ্রমিকের কাজ করতে যাওয়ার ফলে তার কাছে থেকে ছিনাল বা চরিত্রহীনের ভর্ৎসনা পায়। এইরূপ মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আঘাতেও গোধূলী ভেঙ্গে না পড়েও সক্রিয় থাকে। তাই হরোর শারীরিক ব্যধি জীবনমৃত অবস্থায় পৌঁছালে ডাক্তারের কথা মত মানসিক প্রস্তুতি নিয়েও প্রতিবেশী বলদেবের কথায় গুণিনী সদানন্দকে দিয়ে দেখিয়েও তার রোগ বরং বৃদ্ধি পায়। তাই স্বামীকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টায় অর্থের সন্ধানে সে চৌধুরী ঠিকাদারী ফার্মের লোভী ও অসৎ চরিত্রের কর্মচারী নিখিল কর্মকারের কাছে দু হাজার টাকা ভিটাজমি বন্দকি রেখে ধার নেয়। আবার গোধূলীর এই চরম বিপদ কালীন মুহূর্তে নিখিল কর্তক তার মান-ইজ্জত লুণ্ঠিত হলেও স্বামী হরোর জন্য গোধূলী শাশ্বত নারী সত্তার সনাতন রীতি মাফিক উদ্বেলিত হয়ে স্বামীর ঘৃণা ও সন্দেহ দূরীকরণে দৃঢ় কণ্ঠে বলে— ‘‘(হরোর মুখে হাত চাপা দিয়ে চিৎকার করে ওঠে) নাই। ওইলা কথা ফির না কহেন। ওইলা হবার নি পারে।’’— এভাবে ঘটনার প্রবাহে গোধূলী চরিত্রটির মধ্যে নাট্য আবর্ত সৃষ্টি হয়। এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের চরম ঘূর্ণাবর্তে নিখুঁত জীবন্ত চরিত্র হয়ে ওঠে এবং এই চরিত্রটিকে ঘিরে নাট্যআবর্ত সংগঠিত হয়েছে। আবার অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে অতুল ভৌমিক, নিখিল কর্মকার, গুণিন সদানন্দ অনেকটা বাস্তবধর্মী চরিত্র হয়ে উঠেছে। এবং নাটকটির আবেদন বড়ই মর্মস্পর্শী ও করুণ। তাই এই নাটকটির নাট্যক্রিয়া সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাবহ এবং সাহিত্য ব্যঞ্জনা উপেক্ষণীয় নয়।

‘যতীনবাবুর চাকর’ পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক। মূলগল্প: যতীনবাবুর চাকর শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়,

নাট্যরূপ: সুব্রত রায় (১৯৮৬ খ্রি:) প্রকাশিত হয়নি। তবে ছন্দম নাট্যসংস্থার প্রযোজনায় ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে মঞ্চায়িত হয়েছে। এছাড়াও কলকাতার গিরিশ মঞ্চ, শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চ এবং বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ মঞ্চে নাটকটি সার্থক মঞ্চরূপ লাভ করেছে। নাটকটিতে ১৭টি চরিত্র নিয়ে নাট্যমুহূর্তগুলি প্রতিভাত হয়েছে। চরিত্রগুলি: সত্যরাম, হারান, অনিল, ধরণী, পানু, দাক্ষী, বলাই, ফটীক, কেষ্ট, পুন্য, নরেন, কালিকানন্দ, যতীন মণ্ডল, শান্তি, কানু, উপেন সাধু, দীনু প্রভৃতি। এছাড়াও রয়েছে ৮ জন গ্রামবাসী। পানু চরিত্রটি কেন্দ্রীয় চরিত্র, যতীন মণ্ডল প্রতিনায়ক চরিত্র। হারান, অনিল, ধরণী, বলাই, ফটীক, কেষ্ট, নরেন, কানু, শান্তি প্রভৃতি সহকারী চরিত্রের ভূমিকায় চিত্রিত। কালীকানন্দ, যদীনবাবুর গুরুদেব উপেন সাধু, দীনু এবং ৮জন গ্রামবাসী সহায়ক চরিত্রের ভূমিকায় চিত্রিত।

গ্রামবাংলার সমাজ জীবন দেশীয় জোতদার তথা সামন্তপ্রভুদের প্রভাব প্রতিপত্তির দাপটে অতি সাধারণ নিরীহ মানুষদের নিত্তনৈমিত্তক অভাবতাড়িত জীবন কিভাবে তাদের অমানবিক শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে অভাবনীয় করুণবিদারক হয়ে উঠেছিল— তা ফুটিয়ে তোলাই নাটকটির মূল উপজীব্য বিষয়। নাটকটির Key character পানু সমাজের চির নির্যাতিত মানুষের প্রতিনিধি। যতীন মণ্ডল চিরাচরিত একচ্ছত্রাধিপতি জোতদারের প্রতিনিধি চরিত্র। এই যতীনবাবু তার ম্যানেজার সত্যবাবু ও নতুন লাঠিয়াল দীনুকে কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে কৌশল করে নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধির জালচক্র ছড়াতে থাকে। একদিকে ম্যানেজার সত্যবাবু জোতদারের স্থাবর সম্পদ সামলানোর ব্যাপারে দিনমজুর চাকর যথা বলাই, পুন্য, কেষ্ট, ফটীক ও পানুদের অত্যাধিক কায়িক শ্রমের বিনিময়ে খোরাকী ও দরমা কম দিয়ে শোষণ ক্রিয়া অব্যাহত রেখে জোতদারের সাশ্রয় বৃদ্ধি করেন। আবার সাধারণ নিরীহ গ্রামবাসী অনিলকে সুদে টাকা দিয়ে মহাজনী কায়দায় নিষ্ঠুর ও নির্দয়ভাবে শোষণ পদ্ধতি অব্যাহত রেখে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষকে নিষ্পেষিত করেন। অন্যদিকে আবার যতীনবাবু সরকারী প্রকল্পের জন্য মনোনীত বাগঢোলের জমি দখলের উদ্দেশ্যে চড়া দরমায় নতুন লাঠিয়াল দীনুকে নিয়োগ করে পানুদের পৈতৃক সম্পত্তি জবরদখলের ষড়যন্ত্র করে। এইভাবেই যতীন মণ্ডল, সত্যরাম, দীনু প্রভৃতি চরিত্র শ্রেণী চরিত্রের জীবন্ত নাট্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। তবে নাটকের পরিণতিতে পরিলক্ষিত হয় দীনু লাঠিয়ালি পানু ও তার দাদা কানুর সুকৌশলে ক্রমশ চাপ সৃষ্টি করতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত একদিন পানুর উপর শারীরিকভাবে উৎপীড়ণ শুরু করলে বাধ্য হয়ে পানু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদীকণ্ঠে সরব হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে দীনু লাঠিয়াল পরাজিত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এর ফলস্বরূপ জোতদারের নতুন ফন্দীর শিকার হয়ে পানুর কারাবাস হয়। পানু সামগ্রিক মর্যাদা নিয়ে গ্রামের সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল। তাই পৈতৃক সম্পত্তি মাংনায় বা সস্তায় জমিদারের মদতপুষ্ট দীনুর হাতে ছেড়ে দিতে চায়নি। এইভাবে

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়ে চরম অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পানু চরিত্রটি .. ও জীবন্ত হয়ে নাট্যআবর্ত ঘনীভূত হয়েছে নাটকটির আবেদন করুণ, হৃদয় গ্রাহী ও সার্বজনীন ঘটনার যথাযথ নাট্যবৃত্তায়ণ এবং চরিত্র চিত্রণ যথার্থই নাট্যানুগ। সেদিক থেকে নাটকটির সাহিত্যমূল্য অপরিসীম।

'ক্যানে-ক্যান্নে' একটি সামাজিক একাঙ্ক নাটক (১৯৯২ খ্রি:) নাট্যকার নৃপেন্দ্রনাথ মহন্ত নাটকটি রচনা করেন। এই নাটকটি প্রকাশিত না হলেও মঞ্চস্থ হয়েছে হেমতাবাদ সাংস্কৃতিক মঞ্চের প্রযোজনায় কালিয়াগঞ্জের 'নজমু নাট্যনিকেতন' মঞ্চে (২০০৮ খ্রি:) এবং চন্দননগরের রবীন্দ্রভবন মঞ্চে (২-৭ই জানুয়ারী ২০০৯ খ্রি:) মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকটিতে ৭টি চরিত্র— মংলি, হালিম, আকালু, দুলালি, জোলেখা, বেলা রায়, বুলির মা প্রমুখ ৭টি চরিত্র আলোচ্য নাটকে বর্তমান। কেন্দ্রীয় চরিত্র মংলি, প্রধান পার্শ্বচরিত্র দুলালি, অপ্রধান চরিত্র হালিম, আকালু, জোলেখা, বেলা রায়, বুলির মা। নাটকটির মুখ্য উপজীব্য গ্রামীণ সমাজ জীবনে আপামর সাধারণ মানুষ কিভাবে স্বাস্থ্য-সচেতনতামুখীন, সাক্ষরতার প্রাসঙ্গিকতায় ইতিবাচক মনোভাব এবং কুসংস্কারের প্রাচীর ভেদ করে সুস্থ, সহজ ও স্বাভাবিক জীবনবোধে উত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারবে তার ইঙ্গিত নির্দেশ করা।

কেন্দ্রীয় বা প্রধান চরিত্র গ্রাম্য কৃষক রমণী মংলী তার মেয়ে জোলেখার মধ্যে সচেতনতাবোধ জাগাতে তৎপর আবার কখনো স্বামী হালিমের স্ত্রীর কাছে নানা রকমের দাবি, চাওয়া না পাওয়ার মধ্য দিয়ে মতানৈক্য— এভাবে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মংলী যখন অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত, ঠিক সেই সময়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে দুলালী অনেকটা জীবনীয় সমাধানসূত্রে বিশেষত স্বাস্থ সচেতনতাও সমাজ সচেতনতাবোধ জাগিয়ে দিয়ে পার্শ্ব চরিত্রের ভূমিকা পালন করেছে। তবে প্রধান চরিত্র মংলীর চেয়ে দুলালী আকর্ষণীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। অন্যান্য চরিত্র নাট্য পরিকাঠামোর দিক থেকে শিথিল। এমনকি নাটকটির ঘটনার বন্ধনও দুর্বল। সেহেতু সাহিত্যকৃতির দিক থেকে নাটকটি প্রশংসনীয় নয়।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় রচিত নাটকের শিল্পমূল্য (সাহিত্যমূল্য) বিচার:

'মুক্তির ডাক' সমগ্র বাংলা তথা বিশ্ববন্দিত শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মন্মথ রায়ের রচিত ঐতিহাসিক একাঙ্ক নাটকটির দৃশ্য সংখ্যা একটি। 'মুক্তির ডাক' প্রকাশিত হয় 'মন্মথ রায়ের গ্রন্থাবলীতে। প্রকাশক রঘুমতি সাহিত্যমন্দির (বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড), ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২, প্রকাকাল প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন: ১৩৭৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ১লা বৈশাখ: ১৩৯১।

শ্রীবুদ্ধ, বিম্বিসার, সুন্দরক, সুচিত্র, অম্বা, পদ্মা— এ ছয়টি চরিত্র এবং বৌদ্ধযুগের পটভূমিকায় মগধের রাজা বিম্বিসারের শাসন পর্বের একটি আখ্যায়িকার উপর ভিত্তি করে নাটকটি নাট্যমুহূর্ত লাভ করে। এই নাটকটি তীব্র গতিবেগ সম্পন্ন একাঙ্ক নাটক। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব সংঘাত ও কৌতূহলের মধ্য দিয়ে নানা বিরুদ্ধ ভাবমুখী চরিত্রের ক্রমবিকাশ উত্তেজনাময় রুদ্ধ পরিবেশে মানবমনের

অতলগহনের জটিল রূপ প্রকটিত হয়েছে। বিশেষ করে সুন্দরক পদ্মা, অম্বা ও বিম্বিসার এই চারটি চরিত্রই বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা আবর্তিত হয়ে স্বল্প পরিসরের মধ্যে দ্বন্দ্ব জটিল নাট্যআবর্ত সৃষ্টি করেছে এ নাটকে নাট্যকার বৌদ্ধ আখ্যায়িকার নাট্যরূপ তুলে ধরতে গিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও বহু ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন। এর ফলে নাটকের মধ্যে অতি নাটকীয় উপাদান ক্রমে উপস্থিত হয়েছে। এবং কখনো কখনো এই সব চরিত্র ও ঘটনা বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠেনি। যেমন শ্রেষ্ঠী সুন্দরক তার প্রসাদ আম্বাকে দেখে বিম্বিসারও রাজদণ্ড আম্বাকে দান করে সে তার করুণা প্রার্থী হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ নাট্যমুহূর্তগুলি কষ্টকল্পিত ও অবিশ্বাস্যবোধক হয়ে উঠেছে। এতদ সত্ত্বেও অতি দ্রুতবেগে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে হৃদয়াবেগের পরিণতি অর্থাৎ যে জয়-পরাজয় ও মানব প্রকৃতির যে দুজ্ঞেয় রহস্য উন্মোচিত হয়েছে, তার মধ্য দিয়েই নাটকীয় উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মুক্তির ডাক নাটকটির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল কামনা-বাসনার গভীর আকর্ষণে উন্মত্ত মোহ গ্রস্ততা থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। এ নাটকে ঘটনার নানা ঘাত-প্রতিঘাতে জীবনের শেষ পর্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুর রূপে উত্তীর্ণ সুচিত্র কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভূমিকায় চিত্রিত। বিম্বিসার ও অম্বা এই দুটি প্রধান চরিত্র হিসেবে এবং সুন্দরক ও পদ্মা— এই দুটি পাশ্বচরিত্র হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। শ্রেষ্ঠী সুন্দরক নিজগৃহে বারাঙ্গনা-শ্রেষ্ঠী অম্বাকে অভ্যর্থনা করলে পদ্মা অপমানিত হয়ে দুর্জয় ক্রোধ ও অভিমানে ফেটে পড়ে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ সুন্দরক অম্বাকে তার গৃহের স্বত্বদান করলে অম্বার আদেশে পদ্মা স্বীয় প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত হতে বাধ্য হয়। অপরদিকে উক্ত প্রসাদে বিম্বিসার এসে পদ্মাকে অম্বা মনে করে তার প্রতি প্রণয়ীর মতো আচরণ এবং পদ্মার প্রতি অসৎ আচরণের সুবাদে রাজা বিম্বিসার সুন্দর করে নির্বাসন দণ্ড দিলে রাজার সঙ্গে অম্বার বিরোধ বাঁধে। এর ফলে রাজা প্রায়শ্চিত্তের সংকল্প নিয়ে অম্বাকে রাজ্যভার অর্পণ করে পদ্মাকে সঙ্গে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত সাধনে গমনোদ্যত হয়। এর ফলে অম্বার মনে পদ্মাকে রাজার প্রেয়সী ভেবে প্রবল ঈর্ষা জেগে ওঠে এবং বিম্বিসার ও অম্বার মধ্যে সুতীব্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দুজনের মধ্যে নাট্যমুহূর্ত তৈরি হয়। এবং সেই সঙ্গে ঘটনা প্রবাহের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও অভিনব জীবন জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে অম্বা চরিত্রটি অন্তর্দ্বন্দ্বের ভীষণ মূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মোটকথা, নাটকটিতে নারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা, মাতৃত্ব তথা সতীত্ববোধ নারীত্বের আদর্শ ও ধর্ম নিয়ে প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের মূর্ত হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি 'মুক্তির ডাক' নাটকে হৃদয়গ্রাহী আবেদন অর্থাৎ কুলষিত কামনা ও পাপ প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি লাভের ডাক বা আহ্বান ব্যঞ্জিত হয়েছে। সেই ডাক বা আহ্বানে সাড়া দিয়ে সকলে যখন মানসিক দিক দিয়ে তৈরি হয়ে ওঠে— তখন সেই মুক্তিপথের আহ্বায়ক চরিত্র সুচিত্রের মাধ্যমেই তাদের চরিত্রের পাপ-চারিতার Chathersis মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতিতে স্থির হয়েছে এবং চরিত্রগুলি

উজ্জীবন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে অধঃপতন থেকে চিরমুক্তির পথে অগ্রসর হয়। এই নাটকে চরিত্রগুলির অবস্থান ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংস্থাপন নাট্যরীতিসম্মত হলেও আবেগের প্রকাশে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়েছে, যা বাস্তবায়ুক নয়। নাট্যকারের অপরিণত বয়েসের আবেগঘন মানসিক অবস্থান এ ব্যাপারে কিছুটা হলেও দায়বদ্ধ। তবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম একাঙ্ক নাটক হিসেবে 'মুক্তির ডাক' নাটকটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অতুলনীয় এবং সাহিত্যমূল্য অপরিসীম।

'চাঁদসদাগর' মন্মথ রায়ের লেখা একটি পৌরাণিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। এই নাটকটির ৩টি অঙ্কে মধ্যে মোট দৃশ্য সংখ্যা ১৫টি। এবং চরিত্র সংখ্যা ২২টি। এদের মধ্যে কেন্দ্রীয় চরিত্র হল 'চাঁদ সদাগর'। চরিত্রগুলি : মহাদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, যম, ধন্বন্তরী, আস্তিক, বৃশ্চিক, চাঁদ সদাগর, লক্ষীন্দর, দুর্যোধন, নেড়া, ধনা, মনা, সায় সদাগর, চণ্ডী, মনসা, নেতা, তরুণী, সনকা, অমলা, বেহুলা প্রভৃতি। এছাড়াও চা পুরবাসীগণ, সাপুড়েগণ, পূজারীগণ, দৌবারিক, নগরাধ্যাক্ষ, রক্ষিগণ, সর্পসঙ্গিনীগণ, সাপুড়ে-স্ত্রীগণ, দেবদাসীগণ ও সেবাদাসীগণ, পুরবাসিন্নীগণ প্রভৃতি সহায়ক চরিত্রের ভূমিকায় চিত্রিত হয়েছে।

এ নাটকে নাট্যকার চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনা সংস্থাপনের মাধ্যমে নাট্যসংঘাত সৃষ্টি করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ নাটকে একদিকে নিষ্ঠুর প্রকৃতির দেবীর তার অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে অধীনে আনার প্রয়াস করেছেন। অপরদিকে এক অসীমশক্তিধর ব্যক্তিত্ববান পুরুষের কঠোর সংগ্রামমুখর অপরাজেয় বিদ্রোহ। তাই এই নাটকে অলৌকিক ও লৌকিক শক্তির মধ্যে সংঘটিত মহাসংগ্রামের ফলে ভীষণ করুণ ও শ্বাসরোধকারী উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ায় সার্থক ও সুসংহত নাট্য অবয়ব গড়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র চাঁদ সদাগরের হৃদয়াবৃত্তির এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে তাঁর অপরাজেয় পৌরুষ, বজ্রকঠোর ব্যক্তিত্ব ও অনমনীয়।

মনসা চরিত্রটি মঙ্গলকাব্যের মনসাদেবীর মতো করে হেয়, অকারণ নীচতা ও উদ্দেশ্যহীন ক্ষতিকারক চরিত্র রূপে প্রতিপন্ন না করে বরং তাঁর উত্তরণ ঘটিয়েছেন এবং পৌরাণিক দেবী-চরিত্রের মধ্যে আধুনিক মানবীকরণ ফুটে উঠেছে। এ নাটকে নাট্যকার কখনো কখনো চমকপ্রদ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সেই পরিস্থিতির আকস্মিক ও বিপরীত অবস্থা ঘটিয়ে এবং ঘটনার ক্রমবর্ধমান বেগ ও উত্তেজনাময় পরিবেশ সংগঠিত করে নাট্যরস তৈরী করেছেন। চাঁদের সপ্তডিঙা মধুকর তলিয়ে গেছে, তিনি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে উত্থানশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, তাঁর মুখের কাছে বন্ধু চন্দ্রকে দুধের বাটি ধরেছেন ঠিক এই মুহূর্তে প্রাসাদে শঙ্খঘন্টা বেজে উঠলে তিনি কোন্ দেবতার পূজা বলে চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে চন্দ্রকেতু জানান যে দেবী মনসার পূজা সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ ক্রুদ্ধ হয়ে দুধের বাটি ফেলে দিলেন। তখন চন্দকেতু আশ্চর্য হয়ে চাঁদকে জিজ্ঞাসা করে

বলেন— 'তুমি কি পাগল হলে?' চাঁদসদাগর উত্তরে বলেন— 'হ্যাঁ, পাগল হয়েছি, মাতাল হয়েছি— বিষ দিয়েছিলে— খেলুম না। হাঃ হাঃ হাঃ।'

নাটকটির মধ্যে ভক্তিরসের চেয়ে মানবীয় রস প্রাধান্য লাভ করার ফলে আধুনিক জীবনচেতনা বা মানবতাবাদের প্রতীকরূপে চাঁদসদাগর চরিত্রটি উজ্জ্বলরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। তাই এ নাটকটিতে কেন্দ্রীয় আকর্ষণের দিক থেকে মনসা অপেক্ষা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে চাঁদসদাগর। তাই চাঁদের দুর্জয় পৌরুষের কাছে পৌরাণিক ভক্তি রসাশ্রিত দেব-ভাবনার পরাজয় হয়েছে। এমনকি চাঁদ সদাগরের এই অনমীয় পৌরুষের সঙ্গে চাঁদের মানবিক চাওয়া-পাওয়ার সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে নাট্যমুহূর্ত যতোটা চরমরূপে সংগঠিত হয়েছে, তুলনায় দৈবশক্তির সঙ্গে মানব-শক্তির সংঘর্ষ কিংবা মনসার ক্রূর জটিলতার সঙ্গে তেজস্বী চাঁদসদাগরের ও জস্বিতায় সংঘর্ষে ততোটা পরিস্ফুটিত হয়নি। তবে এই নাট্যমুহূর্তের মধ্য দিয়ে চাঁদ চরিত্রটি ট্র্যাজিক মাহাত্ম্য লাভ করেছে।

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আবর্তিত হয়ে দ্বন্দ্ব-সংকুল পরিস্থিতির মধ্যে পড়েও চাঁদ সদাগর বিচলিত ও দ্বিধান্বিত হননি। বরং তিনি কৌপিন সার শুদ্ধ সত্ত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছেন। পৌরুষত্বের চেয়ে জ্ঞানায়ুধকে হাতিয়ার পরম পাথেয় ও অবলম্বন করে নিয়েছেন। এর ফলে মানবধর্মের সঙ্গে যখন নিত্যধর্মের সংঘর্ষ বেঁধেছে তখন তিনি স্থিত প্রঙ্গ— ''চারিদিকে জল ... সম্মুখে পশ্চাতে অসীম অনন্ত শূন্যতা... একা ... একলা ... সাথী শুধু এক নরকঙ্কাল— রাত্রি নেই ... দিন নেই ... চলেছে .. তবু চলেছে— আহার নেই ... নিদ্রা নেই তবু চলেছে ... সে লক্ষীণের কে? তার সঙ্গে লক্ষীণের কি সংস্রব? (সহসা বিকট অট্টহাস্যে)। পুত্র হারিয়েছি, আজ স্ত্রী হারালুম। কারণ, সে আমার কে? আমি তার কে? (ব্যঙ্গ) আমি তো তাকে গর্ভে ধরিনি। সে তো আমায় গর্ভে ধরে নি। অপূর্ব্ব যুক্তি। যাও, কর পূজা— দাও অঞ্জলি, বাধা দেব না।''

আলোচ্য নাটকে মুখ্য পতিপাদ্য বিষয় পুরাণ আশ্রিত দেব-মহিমার প্রভাব থেকে শাশ্বত মানব-মহিমার মুক্তি এবং তার দীপ্যমান রূপকে পরিস্ফুটিত করে তোলা এই নাটকে চরিত্রগুলির অবস্থান, চরিত্রের প্রয়োজনে সুকৌশলে ঘটনার সংস্থাপন এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলির জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘূর্ণাবর্তে প্রতিটি চরিত্র নাট্যানুগ হয়ে উঠেছে।

মোটকথা মানবত্বের মহিমা এ নাটকে মহান ও শাশ্বত রূপ উদ্ভাসিত, যা সার্বভৌমিকতা লাভ করেছেন এবং নাট্যরসের যথার্থ স্ফুরণে নাটকটির নাট্যবেষ্টনী সার্থকভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য নাটকটির সাহিত্য মূল্য অবিসংবাদিত।

'কারাগার' নাট্যকার মন্মথ রায়। পৌরাণিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। অঙ্ক সংখ্যা পাঁচটি। দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে ৪টি দৃশ্য, পঞ্চম অঙ্কে ২টি দৃশ্য। প্রকাশক বসুমতী সাহিত্য মন্দির (বসুমতী কর্পোরেশন

লিমিটেড), ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা-১২, প্রকাশকাল প্রথম সংস্করণ আশ্বিন, ১৩৭৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ১ বৈশাখ, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ।

আলোচ্য নাটকটিতে চরিত্র সংখ্যা ১৫টি। এই ১৫টি চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— উগ্রসেন, কংস, নরক, বিদূরথ, কঙ্কন, বসুদেব, কীর্তিমান, রঞ্জন, দেবকী, চন্দনা, অঞ্জনা, যোগমায়া, ধরিত্রী, মদিরা প্রভৃতি। এছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীকেও এখানে চরিত্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন— 'যাদবগণ', 'নর্তকীগণ' প্রভৃতি। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কংস। কংসের মধ্যে দাবনীয় ও মানবীয় দুই চরিত্রই ফুটে উঠেছে। আর এই দুয়ের অন্তঃর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে চরিত্রটি ট্রাজিক চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

ভয়াবহ নৃশংসতা, দেব বিদ্বেষ, নরকীয় হিংসা, আবার কখনও চন্দনাকে পাওয়ার তীব্র রবাসনা প্রভৃতি নাট্যরস কেন্দ্রীয় চরিত্র কংসকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। চন্দনার প্রতি প্রেম ভালবাসা, না পাওয়ার বেদনা, ঘৃণা প্রভৃতি দর্শক চিত্তে কংসের প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি করে। নাট্যকারের হাতে কংস চরিত্রটি বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটি অসাধারণ চরিত্র হয়ে উঠেছে। কংসের ভিতরকার দুর্বলতা যখন প্রকাশ পাচ্ছে, সে গর্জন করে বলছে— ''আমি নির্মম— আমি নিষ্ঠুরর— আমি শুধু দুর্দান্ত দানব নই। আমি দুনির্বার শয়তান।' তবুও কংসের মনে সুখ নেই—" কিন্তু ওতেও তো ক্ষুধা মিটছে না, পিপাসা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।" চন্দনা কংসের ভিতরের দানব সত্তাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করলে সে বলে ওঠে— ''আর সেই বিশ্বগ্রাসী লেলিহান অগ্নিশিখার রক্ত-আলোকে আলোকিত হয়ে আমরা সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখি— আমার ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত দানবাত্মা তৃপ্তহোক— তৃপ্ত হয়ে নৃত্য করুক থিয়া তাথৈ! থিয়া তাথৈ! থিয়া তাথৈ!" কংসের মধ্যে মানবিক জাগরণও ঘটেছে। ''কেন এই ক্রন্দন? কেন এই দীর্ঘশ্বাস— এই হাহাকার? কার এই অত্যাচার? আমি তাকে— আমি তাকে—" এই রকম একটি অদ্ভুদ ও বিচিত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি করে নাট্যকার দরর্শকমনে নাটকীয় উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছেন। নাটকটিতে নাট্যগতি প্রচণ্ড ও আবেগ উত্তেজনার পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকটিতে ঘটনাধারা উত্তেজনাময়। নাটকটির মূল উপজীব্য বিষয়বস্তু হল অত্যাচারী শাসক এর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করা। সে ক্ষেত্রে নাটকটির সাহিত্যমূল্য অবিসংবাদিত।

ধর্মঘট:

নাট্যকার মন্মথ রায়। সমাজ-রাজনৈতিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। ১৯৫২-৫৩ খ্রি: বিভিন্ন সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে 'মন্মথ রায়ের গ্রন্থাবলী'তে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক বসুমতী সাহিত্য মন্দির (বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড), ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা-১২, প্রকাশকাল: গ্রন্থাবলী রূপে প্রথম সংস্করণ আশ্বিন, ১৩৭৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ১ বৈশাখ,

১৩৯১।

নাটকটিতে কোন অঙ্ক বিভাগ নেই, ৪টি দৃশ্য সমন্বিত। নাটকটিতে মোট চরিত্র সংখ্যা ১৫টি, সহায়ক চরিত্র— দীনবন্ধু চৌধুরি, কোম্পানির চেয়ারম্যান। শ্রমিক সংঘের সর্দার জনদিন দত্ত এবং মহম্মদ ইব্রাহিম প্রধান পার্শ্বচরিত্র হিসেবে বর্তমান। এছাড়াও লোহারাম দাস, লালমিঞা, সুমঙ্গল সেন, মায়া, হারান দাস, পার্বতী প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্র।

আলোচন্য নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় হল সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী নারকীয়ভাবে ঔপনিবেশিকবাদের প্রভুদের দ্বারা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত সেই অমানবিক দৃশ্যটিই তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটি ৪টি দৃশ্যই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় গতিশীল ও স্বতঃস্ফূর্ত। দৃশ্যগুলির গতিমুখরতা কেথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। চেয়ারম্যানের চরিত্রটির মধ্যে অন্তঃর্দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নাটকের শেষ স্তরে দৈহিকভাবে উপস্থিত না থাকলেও নাটকের ঘটনাগুলিকে প্রতিমুহূর্তে সচল করে রেখেছে চেয়ারম্যান চরিত্রটি। হারান,জনার্দন, কনক, পাবর্তী প্রভৃতি চরিত্রগুলি নাট্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উৎকর্ষ হয়ে উঠেছে— কোন এক অদৃশ্যের উপস্থিতি হিন্দু শ্রমিক সর্দার জনার্দন এবং অন্যান্য হিন্দু শ্রমিকদের সঙ্গে মুসলমান শ্রমিক সর্দার ইব্রাহিম ও তার সহ-শ্রমিকের দল আকবর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে আবদ্ধ হয়ে পড়ে জাতিগত সংঘর্ষের সূচিত হয়। এই সূত্র ধরেই নাটকটি সার্থক সমাজ-রাজনৈতিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের এবং নাট্যকারের দক্ষতার পরিচয় ফুটে ওঠে। কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি সহ অন্যান্য চরিত্রগুলি নাটকে যথাযথ ভাবে বিন্যাস্ত হয়েছে এবং ঘটনার জটিলতায় চরিত্রগুলির মধ্যে নাট্য মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে এবং সর্বোপরি এই নাটকের চিরন্তন আবেদন নমুনীয় ও হৃদয়গ্রাহী। সুতরাং এদিক থেকে নাটকটির সাহিত্যমূল্য প্রশ্নাতীত।

‘পথে বিপথে’ নাট্যকার মন্মথ রায়। একটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। প্রকাশক বসুমতী সাহিত্য মন্দির, প্রকশনার কাল প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৭৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১ বৈশাখ ১৩৯১।

চরিত্র সংখ্যা ২১ টি। প্রধান চরিত্র— ভানু চৌধুরী। ক্রিকাল বোস, তিনকড়ি, অবিনাশ, সুনন্দা, মহিম, প্রজাপতি সাত ভট্টাচার্য, ছবি মানদা প্রভৃতি পার্শ্ব চরিত্রের ভূমিকায়। আনন্দম’ ক্লাব ও ‘স্বাগতা রেস্তোরা’ নাটকে মূক চরিত্র রূপে ফুটে উঠেছে এবং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও সহায়ক চরিত্রগুলি— হেড্‌বয়, রেস্তোরাঁর ম্যানেজার, দুজন ব্যবসায়ী, বিচিত্র খদ্দেরের শ্রেণী চরিত্র দুটি ছাত্র, প্রজাপতি অফিসের প্রজাপতি সাত ভট্টাচার্য, চলতি গানের পরম ভক্ত দুই যুবক, বিশ্বম্ভর, বিপিন, কৈলাস, প্রভৃতি চরিত্র নাটকের পটভূমিকা তৈরি করে, নিখুঁত ও বাস্তবভাবে প্রকটিত হয়েছে।

বিপথে ঘূর্ণাবর্তের শিকার হয়ে মানুষ যে চরম অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হয় তার স্ফূরণ

ঘটেছে। নাট্যকার 'পথে বিপথে' নাটকে একেবারে সামাজিক বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে নেমে এসেছেন। নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা, জাল জুয়াচুরি ও নৃসংশ হত্যার যে পরিবেশ নাটকটি প্রকটিত হয়েছে, তা অবশ্যই দর্শকবৃন্দের মনে এক বেসুরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। এই নাটকে চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের সুদক্ষ নাটুকে ছাপ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মানুষের স্বাভাবিক মূল্যবোধ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। নাটকের শেষ স্তরে ভানু চৌধুরির স্পর্শে সুনন্দাও পরিবর্তিত হয়, তার মধ্যে প্রেমের জন্ম হয় এভাবে— ''ওগো তুমি কেন এমন করলে? এমন করে নিজের হাতে নিজের সর্বনাশ করলে!'' এই বিশেষ মুহূর্ত দর্শকের মনে এক দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ত্রিকাল বোস আলোচ্য নাটকে যেন একজন তান্ত্রিক। আর ভানু চৌধুরীর মতো লোকেরা সমাজকে শ্মশান বানিয়ে তার উপর শব দাহ করার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। নেও একদিন সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট সমাজ তাকে জোর করে অসামাজিক করে তুলেছে। ভানু চৌধুরী তার বিপথের ঘটনা জানিয়ে পুলিশের কাছে ধরা দিতে প্রস্তুত। ভানু ও সুনন্দা সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে— ''কিন্তু সুনন্দা ও ফিরে এলে ওকে নিয়ে তোকে চলে যেতে হবে 'আনন্দম' এর বাইরে। যাদের বিবেক আছে, যাদের জীবনে আছে প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, মায়া, মমতা, মনুষ্যত্বের দুর্বলতা 'আনন্দমে' তাদের স্থান নেই। বিদায়ে ভানু— বিদায় মা।'' এই ভাবেই পথ আর বিপথের মধ্যে দ্বন্দ্বফুটে উঠেছে নাটকে। তাই 'পথে বিপথে' নামকরণটি সার্থক হয়েছে বলা যায়। সুস্থ ও সামাজিক জীবনের চলার পথ ধারাবাহিক, কিন্তু অবহেলিত, বিকৃত জীবন নিয়ে এই সুস্থ সামাজিক জীবনে চলার পথ বিপথ নামে পরিচিত। এই পথ আর বিপথের সংঘর্ষের রূপটি নাটকটিকে দর্শকবৃন্দের কাছে উৎকর্ষ করে তুলেছে।

নাটকটির সামাজিক আবেদন চিরসত্য। নাটকটির চরিত্র বিন্যাস, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অবস্থান, ঘটনাপ্রবাহ, নাট্যসংঘাত প্রভৃতি যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে। সুতরাং নাটকটির সাহিত্যমূল্য অপরিসীম।

'স্বর্ণলঙ্কা' একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটক। নাট্যকার শিবপ্রসাদ কর। প্রকাশক আর এইচ. শ্রীমান এণ্ড সন্স, ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা। ১৯৫৪ খ্রি:'নাট্যনিকেতন' কলকাতা, ৩০ শে শ্রাবণ, ১৯৩৬ খ্রি: প্রথম অভিনয় হয়।

দৃশ্যানুক্রম: নাটকটির প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্গে তিনটি, তৃতীয় অঙ্কে তিনটি, চতুর্থ অঙ্কে ছয়টি এবং পঞ্চম অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য রয়েছে।

চরিত্র: সমুদ্র, ব্রহ্মা, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, রাবণ, বিভীষণ, মারীচ, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাট, নিকুরুম্ভ, সুগ্রীব তরুণী সেন, অঙ্গদ, হনুমান, অনুচর, প্রহরী, দূত, বাদ্যকারগণ প্রভৃতি পুরুষ চরিত্রে। জগন্মাতা, মন্দোদরী, সীতা, সরমা, শূপর্ণখা, প্রমীলা, শবরী, তারা, রুমা, প্রহরিণী, এছাড়া দেবীগণ, অপ্সরাগণ প্রভৃতি নারী চরিত্র।

নাটকের সংলাপ কাব্যিক ছন্দে পরিবেশিত। এখানে নাট্যক্রিয়া ও ঘটনার আবর্ত তৈরি হয়েছে। নাটকের সংলাপগুলি কাব্যিক আবেগে থাকলেও এবং ভাষাভাব গভীর হলেও চরিত্রগুলি এখানে গতিহীন, প্রাণহীন। রাম-সীতা, রাবণ-মন্দোদরী, প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান চরিত্রে স্পন্দন নাট্যরস পাওয়া যায়। কিন্তু মেঘনাদ, বালী, অঙ্গদ, সুগ্রীব, সরমা প্রভৃতি চরিত্রগুলি নাট্যরসহীন, প্রাণহীন, অতি সহজ সরল। দেবতার প্রধান্যই দেখা গেছে প্রতিটি চরিত্রের প্রকাশে। চরিত্রগুলি কৃত্রিম এবং প্রকাশে ও প্রতিক্রিয়ায় পৌরাণিক ভাবনামুখী।

শয়তানরূপে দেবতার আরাধনা এবং দাস্যরসে শিষ্ট হয়ে দেবতার আরাধনা— এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব মূল উপজীব্য। সীতা চরিত্রটি নাটকটিতে জীবন্ত ও প্রাণবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। সীতা চরিত্রটির মধ্যে স্নেহ, মায়া মমতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। সে শুধু স্বামীর শোকে কাতর নয়, শোক সন্তপ স্বর্ণলঙ্কার প্রতিও সে কাতর ও অনুভূতি সম্পন্ন। মন্দোদরী চরিত্রটিতেও মমতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

আরাধনার মাধ্যমে ভগবানের সাক্ষাৎলাভ— নাটকটির মূল উপজীব্য। রাম আর রাবণ, দুজনেরই উদ্দেশ্য এক কিন্তু পদ্ধতি আলাদা। সংঘর্ষের মাধ্যমে রাবণ স্বর্ণলঙ্কাকে ধ্বংসের শিকার করে এই উদ্দেশ্য নিয়ে সে যাতে ভগবান রামের হাতে মৃত্যু বরণ করতে পারে— চিরতরে মুক্তি পাবার জন্য। নাটকটির শেষ পরিণতি করুণ হলেও ট্র্যাজেডির গুণে গুণান্বিত হয়ে উঠতে পারেনি। তাই নাট্যকারের চরিত্র গঠন দক্ষতা হীনতার ছাপ ... একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটক করার প্রয়াসটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। অবিভক্ত দিনাজপুর তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের নাট্য সৃজন পর্বের প্রত্যূষ লগ্নে এইরূপ পৌরাণিক নাটক রচনা করার প্রয়াস নিঃসন্দেহে জেলার নাট্যচর্চার জগতে আলোড়ন জাগিয়ে অভাবনীয় মৃদ্ধি করে তুলেছিল।

'প্রতিষ্ঠা' শিবপ্রসাদ করের ঐতিহাসিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাট্যকার নিজে নাটকটি প্রকাশ করেন। প্রকাশ হয়, মেট্‌কাফ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৪ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রিট, কলিকাতা। খ্রি: এর উল্লেখ নেই।

নাটকটির প্রথম অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে ছয়টি দৃশ্যও পঞ্চম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য রয়েছে। নাটকটিতে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে রয়েছে বাংলার পাল বংশের রামপালদেব, কুমারপালদেব, রাজা সোম, কৈবর্ত্তের অধিপতি ভীম, রাষ্ট্রকুট অধিপতি শিবরাজ, রাঘব সর্দার প্রভৃতি পুরুষ চরিত্র। স্ত্রী চরিত্রগুলি লক্ষ্মী, রমা, তারা রুমা প্রভৃতি। নাটকের ঘটনাপ্রাবহ ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে নিয়েই। কৈবর্ত্ত অধিপতি ভীম বালরাজাদের রাজ্য দখল করে নেয়। কৈবর্ত্ত অধিপতি ভীম গৌড়বঙ্গের সম্রাট হন। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মহীপাল দেবের ভাই রামপালদেব সামন্ত রাজাদের সাহায্যে কৈবর্ত্তের হাত থেকে রাজ্যকে উদ্ধার করে।

নাটকের চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক হলেও, চরিত্রগুলি এখানে নিষ্প্রভ, গতিহীন, মূল চরিত্র, রামপালদেব বীর হয়েও বীর হয়ে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে রাঘব সর্দার চরিত্রটি অপ্রধান হয়েও নিজস্ব দীপ্তি ও বীরত্বে বলীয়ান হয়ে উঠেছে। ভূষণ চরিত্রটি নাট্যচরিত্র লাভ করেছে। ভূষণ চরিত্রটি 'type' চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে প্রকাশে সক্ষম হয়েছে। ভীম চরিত্রটি সার্থক নাট্যচরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। নারী চরিত্রগুলি বিশেষ করে লক্ষ্মী, রমা, রুক্মা প্রভৃতি চরিত্রে নাটকীয়তার স্ফুরণ তেমন দেখা যায়নি। তবে উল্লেখ করতেই হয় তারা চরিত্রটি সার্থক নাট্যচরিত্র হয়ে উঠতে পেরেছে। এ কারণে যে, নারীর মায়া, মমতা, প্রেম, প্রেমিকার আবেগ বিচ্ছেদ প্রভৃতি এই চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। নাটকের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির তুলনায় অপ্রধান চরিত্রগুলিতেই বেশি স্পন্দন পাওয়া যায়। সংলাপগুলির অনেক স্থানেই দীর্ঘ হওয়ায় চারিত্রিক দ্বন্দ্ব সংঘাত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ততোটা পরিস্ফুটিত হয়নি। যুদ্ধের দৃশ্যগুলিতে তেমন ভয়াবহতা নেই। কৈবর্ত অধিপতিরা ক্ষত্রিয় শাসন অধিকার করে নেওয়ায় পুনরায় ক্ষত্রিয় রাজারা তাদের হৃত গৌরব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এটিই হল নাটকটির মূলভাব। সুতরাং নাটকটির 'প্রতিষ্ঠা' নামকরণটিও সার্থক ও যথার্থ হয়েছে। তাই নাটকটির নাট্যকৃতির তুলনায় সাহিত্যমূল্য অস্বীকার করা যায় না।

'আজব বিচার' নাট্যকার পরেশ ঘোষের একটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। প্রকাশনায় শ্রীমতী মীরা ঘোষ, ৫৯, দিঘিরপাড় মোড়, কলিকাতা-৪৮, প্রকাশনার কাল ১৩৭৯ সাল। চারটি দৃশ্য সংখ্যা বিশিষ্ট, কোন অঙ্ক সংখ্যা নেই।

নাটকটিতে চরিত্র চিত্রায়ণের বিশেষ দক্ষতা সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। নাটকটির মূল চরিত্র বটুকেশ্বর, প্রতিনায়িকা চরিত্র মল্লিকা। অন্যান্য চরিত্রগুলি হল— মি: পাল, মি: রায়, মি: দত্ত, জগমোহন, বিবেক সারথী, পুলিশ ইন্সপেক্টর, পরিমল রায়, মেজর সান্যাল, রামখেলান, বিচারক, কুণ্ডলা, বনলতা প্রভৃতি।

নাটকটি প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ অক্টোবর মির্নাভা থিয়েটারে। এ নাটকে নাট্যকার নিজে বটুকেশ্বর নাটকের দৃশ্যগুলি পাস্পরিক কার্যকারণ সূত্রে বিন্যস্ত। নাটকের কাহিনী চন্দ্রাবতী দেবীর খুনের ব্যাপারটি নিয়ে। নাটকটি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রধান। চন্দ্রাবতীর খুনের ঘটনার মুহূর্তগুলিতে suspense তৈরি হয়েছে। নাটকটির Key idea হল চন্দ্রাবতীর খুন হবার ঘটনা। কেন্দ্রীয় চরিত্র বটুকেশ্বর নাট্যগুণে সমৃদ্ধ চরিত্র। মল্লিকা চরিত্রটিও নাট্যরসের ব্যবহারে পূরিপূর্ণ। এখানেই নাট্যকারের দক্ষতা প্রকাশ পায়। প্রতিনায়িকা মল্লিকা চরিত্রটি suspense-এর বাতাবরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিটি চরিত্র একই সরলরেখায় নাট্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলেছে। প্রতি নায়িকা মল্লিকা চরিত্রটি দর্শকের ঘৃণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাটকের পরিণতিতে বিচারকের

রায় দানের পর মল্লিকা যখন সে মি: রায়কে খুন করে কেঁদে ওঠে, তখন দর্শক সহ ব্যারিস্টার এর মনে চরিত্রটির প্রতি সহানুভূতি জাগে। পুলিশ, উকিল ব্যারিস্টার সকলে খুনির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে আবার যখন ভুল বুঝতে পারে তখন মল্লিকা চরিত্রটির রহস্য জালের উন্মোচন ঘটে। ব্যরিস্টারের কাছে মল্লিকা চরিত্রটি কেন্দ্রীয় ঘটনার সঙ্গে প্রতিটি চরিত্রের চরিত্রায়ণ ঘটিয়েছেন। ক্যাপ্টেন মি: রায় ভদ্রমুযোশী যে একটি শয়তান চরিত্র, তার প্রকাশ ঘটিয়েছে মল্লিকা। অপরদিকে বটুকেশ্বর চরিত্রটি ঘটনার গতি প্রকৃতি রচনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে।

সুতরাং নাটকটিতে যথেষ্ট suspense রয়েছে। যার ফলে নাট্যবেষ্টনী সংগঠিত হয়েছে এবং সেই দিক থেকে নাটকটির সাহিত্য মূল্য অপরিসীম। নাট্য

'মানবী মুদ্রা' সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাট্যকার পরেশ ঘোষের লেখা। নাটকটির প্রকাশনায় মীরা ঘোষ, প্রকাশনাকাল ১৯৭৪ খ্রি:, ১৫ আগস্ট। চারটি দৃশ্য নিয়ে সংগঠিত। নাটকটিতে কোন অঙ্ক বিভাগ নেই। দৃশ্যগুলি ঘটনার সূত্রে সবিন্যস্ত। আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রয় চরিত্র হল অঞ্জনা এবং অঞ্জনা চত্রিটিই নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলিকে প্রভাবিত করেছে। প্রায় সমস্ত চরিত্রই চিত্রায়িত করা হয়েছে স্বভাবে। কামনা বাসনায় তাড়িত হয়ে কাজল, তেজেন্দ্র, সঞ্জব, ভোম্বল প্রভৃতি চরিত্রগুলি অঞ্জনাকে দৈহিকভাবে পাবার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে রবি চরিত্রটি এদের থেকে আলাদা দিনে। রবি প্রেমকে ঈশ্বরের শিল্পত রূপ বলে মনে করে। সে মনে করে মানুষের হৃদয়ে প্রেম কুৎসিত এক মানবিক আকাঙ্ক্ষার রূপ—''প্রেম? যে প্রেমে তোমার বিশ্ব সংসার চলে, তার আসল রূপটা কি? প্রেম সুন্দর, না কুৎসিত?"

অন্যান্য চরিত্রগুলি যেমন শঙ্কর, রাখালদা, রমেন, শিবেন, রামলাল প্রভৃতি মূল উপজীব্য ভাবকে কিছুটা কৌতুক, আবার কিছুটা গতিশীল করে দর্শক দরবারে উপস্থাপন করতে সাহায্য করেছে। নাটকের শেষ পর্যায়ে শঙ্কর চরিত্রটি কৌতুক তৈরি করে বেশ সক্ষম হাস্যরসাত্মক চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নাটকের ক্লাইম্যাক্স স্তরে তেজেন্দ্র চরিত্রটি Tragic পরিণতি লাভ করেছে। তেজেন্দ্র তার স্ত্রীকে পুরুষ বন্ধুদের সাথে অবাধ স্বাধীনতার সুযোগ দিয়েছে, নায়িকা হবার সুযোগ দিয়েছে অর্থের শক্তিতে। আবার সে কখনও হয়ে উঠেছে অত্যাচারী, ব্যভিচার পুরুষ। অঞ্জনা শেষে আত্মহত্যা করে, আর প্রেমের করুণ পরিণতিতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তেজেন্দ্র চরিত্রটি সার্থক ট্র্যাজিক চরিত্রের রূপ পরিগ্রহ করে চিত্রিত হয়েছে। নাটকটি নাট্যগুণ সমৃদ্ধ হয়ে নাট্যরস স্ফূরণে সার্থকতা লাভ করায় সাহিত্যমূল্য অবিসংবাদিত।

'ভাঙাপট' পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক। নাট্যকার Henrich von kleist-এর নাটক Der

Zerbrochene Krung, বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করেন নাট্যকার নীহার ভট্টাচার্য। প্রকাশক-অনন্য প্রকাশন, ৬৬ কলেজ স্ট্রিট (দ্বিতল), কলিকাতা-১২। প্রথম প্রকাশ হয়- ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭২।

দৃশ্য সংখ্যা ৭টি। নাটকটিতে কোন অঙ্ক বিভাজন নেই। দৃশ্যগুলি কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ। মোট চরিত্র সংখ্যা ১১টি— লক্ষ্মী, মনু, আলো, লক্ষ্মীর মা, মতির মা, ইতু, এস.ডি.ও.; ভোলা, রূপা প্রভৃতি। কেন্দ্রীয় চরিত্র মোড়ল, মনু, প্রধান পার্শ্বচরিত্র রূপা। অপ্রধান চরিত্রগুলি নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনাকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

মোড়ল চরিত্রটি type চরিত্রের সার্থক রূপ লাভ করেছে। নাটকের কোন চরিত্রই অপ্রাসঙ্গীক হয়ে ওঠেনি। প্রতিটি চরিত্রই নাটকের কেন্দ্রীয় ভাবমুখী। এস.ডি.ও. চরিত্রটি একটু ব্যতিক্রমী রূপে ফুটে উঠেছে। ইতু মমতাময়ী প্রেমিক নারী সত্ত্বা। রূপা চরিত্রটির চরিত্রায়া স্বাভাবিক। রূপা চরিত্রটি সহজ সরল গ্রাম্য মানসিকতার চরিত্র হয়ে উঠেছে। রূপা তার প্রেমিক। ঘটনাক্রমে নিজে ইতু অপমানিত হয়েছে কিন্তু রূপার যাতে কোন ক্ষতি না হয়, সে কারণে মোড়লের নির্লজ্জ পৈশাচিকতা সে গোপন রাখে, বিচারের সভায় সে বলে উঠেছিল— ''রূপা ওটা ভাঙ্গেনি। আমি সত্যি করছি— সত্যি, সত্যি, সত্যি। কে ভেঙ্গেছে হুজুর, আমি জানি। কিন্তু তার নাম আমি নিতে পারব না হুজুর, ঠাকুর জানেন কেন নিতে পারবো না। সে কথা আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবেন না।'' এখানে একটি suspense এর বাতাবরণ তৈরি হয়েছে এবং যথেষ্ট Thrill ও রয়েছে। এর ফলে নাটকের ঘটনাপ্রবাহ গতিশীল হয় এবং নাটকের পরিণতির স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

রূপা আর ইতুর ভালবাসার পটটি একটি বাস্তব মাটির পট। মোড়লের আসল রূপ যখন প্রকাশ পায় তখন ভাঙাপট আবার জোড়া লাগে। রূপা ইতুর পুনঃমিলন হয় এবং তারা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। ভাঙাপটটি এখানে একটি রূপকমাত্র। নাটকটির সাহিত্যমূল্য অস্বীকার করা যায় না। কারণ নাটকটি রূপান্তরিত রূপ হলেও যথেষ্ট নাট্যরস সমৃদ্ধ চরিত্র চিত্রণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি নাট্যকৃতির দাবি রাখে।

'রাস্তা' নাট্যকার নীহার ভট্টচার্য। একটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। প্রকাশক নাট্যচিন্তা নাট্যতীর্থ, নাটক সংস্কৃতি সংবাদ ত্রৈমাসিক, বিশেষ সংখ্যা-১, বালুরঘাট, প্রকাশকাল ১৯৯০খ্রি:।

নাটকটিতে চারটি দৃশ্য রয়েছে। কোন অঙ্ক বিভাগ নেই। দৃশ্যগুলির মধ্যে সুগঠিত বন্ধন রয়েছে এবং ঘটনাসূত্রে পারম্পর্য পূর্ণ। তবে নাটকটির বিশেষ পরিণতি নেই— তাই নাটকটিকে যথার্থ পূর্ণাঙ্গ নাটক হিসেবে অভিহিত করা যায় না।

নাটকটিতে চরিত্র সংখ্যা খুব কম। মদন, কাঞ্ছী, রঘুনাথ, মাধো, হারু যতি, ইঞ্জিনিয়ার মালিক এই আটটি চরিত্র নিয়ে নাটকটি সংগঠিত। চরিত্রগুলি খুব মজবুত নয়। প্রধান চরিত্র হিসেবে কাঞ্ছী

ও মদন কিছুটা সংঘাত পূর্ণ। চরিত্র দুটির মধ্যে কোন পাস্পরিক বোঝাপড়া নেই। মালিক চরিত্রটিতে কোন দ্বন্দ্ব দেখা যায়নি, কোনভাবেই ঘাত-প্রতিঘাত মুখর হয়নি। চরিত্রটির বুনন খুবই আলগা। নাট্যপণিতিও খুব স্পষ্ট নয়। সেই রাতে ঝড়ো আবহাওয়ায় সহশ্রমিকদের হারিয়ে কাঁদা ও রক্তের দাগ, নিয়ে রঘুনাথ ও মাধোর আবির্ভাব ঘটে শেষ দৃশ্যে। সেই আবির্ভাবের মধ্যে কোন উৎকণ্ঠা নেই, নেই কোন উদ্বেগ, নেই কোন ইঙ্গিত। মালিক উদ্বিগ্ন হলেও রঘুনাথ, মাধো রিক্তাপ। রঘুনাথ মালিকের ঘর বন্ধ করে দেয় বাইরে থেকে এতে শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিবাদ, প্রতিহিংসা নেই।

নাট্যবিন্যাস এখানে সুসংহতভাবে বিন্যস্ত হয়নি। চরিত্রগুলির মধ্যে কোন ঘাত প্রতিঘাত ফুটে ওঠেনি। শ্রমিকের শ্রম ও রূপযৌবন মালিক শ্রেণীর দ্বারা চিরকাল ধর্মিত ও লাঞ্ছিত— এই চিরন্তন সত্যটি মূলভাব নাটকে ব্যক্ত হয়েছে।

'ভোর' এটি একটি সামাজিক একাঙ্ক নাটক। নাটকটির রচনাকার নির্মলেন্দু তালুকদার। নাটকটির প্রকাশনায় নাট্যচিন্তা নাট্যতীর্থ, নাটক-সংস্কৃতি সংবাদ পত্রিকা, একাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, প্রকাশনার কাল-২০০১খ্রিস্টাব্দ।

নাটকটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ভারতবর্ষের জাতপাত তথা সাম্প্রতিক দ্বন্দ্বে ধর্মীয় বিষয়টি এতটা নির্লজ্জভাবে প্রকটিত হয়, তার ফলে এক শ্রেণীর প্রাচীন পন্থী মানুষকে তাদের কূপমণ্ডুক বিশ্বাস থেকে টলানো যায়না, আবার ঠিক তার বিপরীতে রয়েছে আধুনিক উদার মনস্ক প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক নবপ্রজন্মের তরুণ সম্প্রদায় যারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধে প্রকৃত ধারক ও বাহক— তারই এক বাস্তব নিদর্শন এ নাটকে প্রতিভাত হয়েছে।

আলোচ্য নাটকটিতে ৮টি চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যমুহূর্তগুলি প্রস্ফুটিত হয়েছে। আচার্য হরিনাথ শাস্ত্রী, প্রভাকর শাস্ত্রী, রামশরণ মিশির, মৌলানা আলিনুদ্দীন, রহিম, ডাক্তার বাবু, চন্দ্রা দুজন ভদ্রলোক। আশ্চার্য হরিনাথ শাস্ত্রী চরিত্রটি প্রধান বা কেন্দ্রীয় চরিত্র, প্রভাকর শাস্ত্রী রামনারায়ণ মিশির, মৌলানা আলিনুদ্দীন রহিম, ডাক্তারবাবু, দুজন ভদ্রলোক অপ্রধান চরিত্রের ভূমিকায় রূপায়িত। নাটকটির কাহিনীর মধ্যে আধুনিক জনজীবনে ধর্মীয় বাতাবরণকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেন্টের উদ্রেক করে এমন বিচ্ছিন্ন ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে, যা বর্তমান সময়ের আধুনিক মানব সভ্যতার সংকটপূর্ণ বাস্তব চিত্র এবং এই সংঘটিত খণ্ড ঘটনাগুলি নাট্য ব্যঞ্জনায় সার্থকতা লাভে সক্ষম। কেন্দ্রীয় চরিত্র আচার্য হরিনাথ শাস্ত্রী বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনাতন হিন্দুধর্মের উপর আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা রূপে আমন্ত্রণে প্রবল আগ্রহান্বিত হয়ে সম্মতি জানিয়ে বেনারস যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তার এই সম্মতি ও একনিষ্ঠতায় গোড়া প্রাচীন পন্থী মানসিকতার বাস্তব রূপ ফুটে ওঠে। অপরদিকে ছেলে প্রভাকর বাবাকে কিছুদিন আগে কাশীতে সামান্য একটি কারণে হিন্দু-মুসলমানের

মধ্যে ... দাঙ্গা হয়। সেই জন্য বাবাকে বক্তব্য প্রদানে নিষেধ করলে তিনি রুষ্ট হয়ে বলে ওঠেন— ''তুমি কি বিশ্বাস করোনা— হিন্দুকে হিন্দু না রাখলে কে কে বলেবে? তুমি ভারতেকে একটা হিন্দু রাষ্ট্র বলে মনে করো না? তুমি কি বিশুদ্ধ অর্থরক্তে বিশ্বাস করো না প্রভাকর?'' বাবার প্রশ্নের উত্তর প্রভাকর বলে ওঠে — ''... আমি জানি— হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? কিন্তু আপনার ঐ বক্তব্য ধর্মনিরপেক্ষ দেশের পক্ষে মারাত্মক।'' এরপরও প্রভাকর বাবাকে আর একবার অনুরোধ জানিয়ে বলে— ''তবু আমি আর একবার ভাবতে বলছি— ''তবু আমি আর একবার ভাবতে বলছি।''— এই কথার মধ্য দিয়ে নিখুঁত জীবন্ত চরিত্র রূপে চিত্রিত হয়েছে। আবার পুত্রবধূ চন্দ্রাও আপত্তি করে শ্বশুরকে বলে— না বাবা। আমি আপনাকে আশ্রদ্ধা করিনি। আমি শুধু বলতে চাই, আপনি ঘড়ির কাটাকে জোর করে পিছিয়ে দিতে চাইছেন। এ অন্যায়— এগ নীতিবিরুদ্ধ কাজ।'' এতে চন্দ্রা নারীসুলভ বিনীতভাবে কণ্ঠে সক্রিয় হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে সার্থক পার্শ্ব চরিত্র রূপে নাট্যচরিত্র হয়ে উঠেছে।

আবার ঘটনাক্রমে আচার্য হাবিলাস শাস্ত্রী বেনারসে বক্তব্য প্রদানের পরিসম্পাতেই চিঠির মাধ্যমে পুত্রের অসুস্থতার খবর পেয়ে বাড়িতে এসে জানতে পারেন মৌলানা আমিনুদ্দিনের সহযোগিতা ও মৌলানার ছেলে রহিমের প্রভাকরকে রক্তদানের খবরে তার মধ্যে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং নাট্যক্রিয়ার দ্বন্দ্ব সংঘাতে চরিত্রটির মধ্যে পরিশেষে প্রগতিশীল উদার মানবিকতার জাগরণ ঘটে। অর্থাৎ তিনি তার প্রতিবেশী মৌলানা আলিমুদ্দিনকে উষ্ণ আলিঙ্গন করে তার এই ভাবে অবস্থান গত পরিবর্তনে মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ চরিত্র হয়ে ওঠে এবং এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আবর্ত। মৌলানা আমিনুদ্দিন, রহিম প্রভৃতি বাদ দিয়ে আলাদা ভাবে প্রকটিত হয়ে উঠতে পারেনি। এই চরিত্রগুলির মধ্যে ভালো মন্দের অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ও মানবিক মূল্যবোধে বাস্তব চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধই বিশ্বের মানব সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে এতদ্ব্যতীত আর কোন পন্থা নেই— এই সারস্বত সত্যটি আলোচ্যনাটকে বেশ সহজ ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং নাটকটির আবেদন শাশ্বত মানবিক, হৃদয়গ্রাহী ও সার্বজনীন। সে কারণে নাটকটির নাট্যকৃতি ও আথিত্যকৃতি অভিনন্দনযোগ্য।

দেবাংশী নাটকটির প্রথম অভিনয়--- ত্রিতীর্থের প্রযোজনায় নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ও পরিচালনায় গোবিন্দ অঙ্গন কল্যাণ বালুরঘাট, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৮৩। এরপর নাটকটি অভিনীত হয়— বিদ্যামন্দির, ১-২ মার্চ ১৯৮৪ খ্রি:, ক্যাপস্টান ফ্লেভার সিলেকশন্জ্ ও সীগাল এমপায়ার-এর পরিবেশনায় কলকাতায় প্রথম অভিনয় হয়। একাডেমী (কলকাতা), ১জুন,

১৯৮৫, নান্দীকার আয়োজিত জাতীয় নাট্যমেলায়। চেনা অচেনা আয়োজিত বিদ্যামন্দির নাট্যোৎসব, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫। রবীন্দ্রসদন, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর, ১৯৯২, নান্দীপট আয়োজিত পদ্মা গঙ্গা উৎসবে।

এই সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটকটিতে কোন অঙ্ক বিভাজন নেই। মোট ১৭টি দৃশ্যে কাহিনী পরিবৃত্ত হয়ে নাট্যরূপ গড়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে সারবান লোহার এক প্রতিনায়ক চরিত্ররূপে দেবেন মণ্ডল ও বিনোদ মণ্ডল। পার্শ্বচরিত্ররূপে বিরাম সামসের, গোষ্ঠ, ব্রজেন বৈজা ঝড়ু, রঘুনাথ বিমান, মুখন, সেতু, গিদন, নগনা, চৈতা, বনমালী জগদীশ, জাফর পঞ্চদা, রুহিনী, অনাথ, মোক্ষদা, সুশীলা, কৌশল্যা, জেবনের বৌ প্রভৃতি। সহায়ক চরিত্ররূপে বিরামের চেলা, সামসেরের চেলা, দশ সমাজ (গ্রামবাসী) সুখনের ছেলে, গ্রামবাসী, জনতা (গ্রামবাসী) গ্রাম্য মহিলা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণ প্রভৃতি।

নাটকটির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হল মানুষের দ্বারা মানুষই কিভাবে দেবতার অংশ স্বরূপ দেবাংশীতে উত্তীর্ণ হয় এবং পরিণতিতে সংস্কার থেকে মুক্তি অভিমুখীনতা অর্থাৎ দেবাংশী দেবত্ব এবং মানবিকত্ব এ দুই টানাপোড়েনের যন্ত্রণা বা চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব-এর সঙ্গে গ্রামীণ সমস্যার জাল দেবাংশীকে গ্রাস করে, যার ফলে করুণ মর্মবিদারক মানবিক মূল্যবোধের শিকার হয়। যা কেন্দ্রীয় চরিত্র সারবানের করুণ আর্তিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে— ''আইজ মোর কথা কবার দিন আসছে। মোর কথা আপনাহরের শুইনবা হোবে। এই তিরিশ বছর ধইরে থানে অপনেরা হামাক ভক্তি করছেন, পূজা দিছেন— মুই সিলা নিছি। মুই মহাপাপ করিছি। সি পূজায় মোর অধিকার নাই, মুই তাই নিছি। মোক ক্ষমা কইরে দেন আপনেরা সব। মোর কথা শোনেন সব। মুই সারবান লোহার, মোর বাপের নাম হীরামন লোহার। আপনাহরের দশজনের মতই মুই একটা মানুষ। একটা হালুয়া চাষী।''

আলোচ্য দেবাংশী নাটকটি গল্পকার অভিজিৎ সেনের বিরাট পটভূমিতে অঙ্কিত কাহিনী নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের সুনিপুন বুননে বস্তুতঃ নাটকীয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। এই সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটকটি হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাট্যকৃতির সফল প্রয়াস ও সার্থক সৃষ্টি। এই নাটকের চরিত্রগুলি ঘটনার আবর্তে নিজের পথে চলে এবং এর ফলে খুব স্বাভাবিকভাবে তাদের জীবনে অমোঘ পরিণতি ঘনিয়ে এসে যথার্থ নাট্যমুহূর্ত তৈরী করেছে। তবে প্রতিটি চরিত্র কেন্দ্রীয় ভাবানুগ ও পরিণামমুখী। কেন্দ্রীয় চরিত্র সারবান দেবাংশী স্বাভাবিক ছন্দে শিষ্য..... সংস্কারের অপ্রতিহত শাসনে বিরাজ করেন। কিন্তু তাঁর এই বিশ্বাসের স্বর্গে প্রথম সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি করে সেতু বর্মন। তার শস্যভরা জমি গ্রামের জোতদার দেবেন মণ্ডল ফেরৎ কবলার অজুহাতে জোর পূর্বক দখল নিতে চাওয়ায় দুর্বল সেতু বাধ্য হয়ে অনন্যোপ হয়ে দেবাংশীর কাছে বিচার প্রার্থনা করায় বিমূঢ় হয়ে পড়ে সে তার অন্তরের কথা ব্যক্ত করে এতদিন অদৃশ্য কিছু শক্তির সঙ্গে লড়াই সীমাবদ্ধ

ছিল কিন্তু আজ সমাজের প্রভাবশালী সামন্ত প্রভুর বিরুদ্ধে মা বিষহরির বিধান মোটেই কার্যকরী হবে কি হবে না— এই প্রবল সংশয় তার মধ্যে জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় নাট্যক্রিয়ার দ্বন্দ্ব সংঘাত প্রবলতর হয়েছে। তবে যেহেতু এই দেবেন মণ্ডলের বাবার কাছে দেবাংশীর বাবা ঋণ শোধে অপরাগ হওয়ায় জমি হারান, সেহেতু সেতুর সপক্ষে বিধান যাওয়ায় দেবেন মণ্ডল সারবানকে শাসায় ও অপমান করে। এ ঘটনায় দুঃখে কাতর হয়ে ভেঙ্গে পড়ে সে করুণ কণ্ঠে মা বিষহরিকে ... এরপরে কাকতালীয় ভাবে সর্পদংশনে দেবেন মারা যায়, যা দেবেনের স্ত্রী ও গ্রামের লোকের মধ্যে দেবাংশীর ঐশী শক্তির পরিচয় বলে তাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস জেগে ওঠে। কিন্তু তাদের এই বিশ্বাসে আঘাত হানে দেবেন মণ্ডলের ছোট ছেলে বিনোদ। সে বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য প্রথমে সেতুকে শাসায় তারপর দেবাংশীকে অপমান করে এবং প্রহার করে। এই ঘটনায় গ্রামের সাধারণ লোকেরা ভেবেছিল বিনোদের উপর মা বিষহরির অভিশাপ নেমে আসবে। কিন্তু দেবাংশী বুঝতে পারে দেবতার রোষ বিনোদের ক্ষতি করতে পারবে না। তাই মন্মথের উদ্ভূত সমস্যা মানুষ নিজের আত্মশক্তি ও সংঘবদ্ধভাবে দূর করতে পারে। তাই বিনোদ যখন সেতুর বিবাহিত কন্যা সুশীলার শ্লীলতা হরণ করে তখন সে গ্রামবাসীদের জাগ্রত জলশক্তির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। মোটকথা বিরাট একজনমানসের প্রচলিত চিরাচরিত সংস্কার ও বিশ্বাস নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এ নাটকে নিখুত নাট্যক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তৈরিতে সক্ষম হয়েছে এবং অন্যান্য চরিত্রগুলি নাট্যপ্রাণতা অর্জন করেছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সেই বিশ্বাস দেবত্বের স্তর থেকে মনুষ্যত্বের স্তরে উত্তরণ লাভ করেছে অর্থাৎ নাটকে দেবভাবনাকে অতিক্রম করে মানবভাবনায় প্রতিষ্ঠা অর্জন-কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত ও পারসম্পর্যবাহী হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি নাটকটির আবেদন মানবিক ও সর্বজন হৃদয়গ্রাহী। আলোচ্য নাটকটির সাহিত্যমূল্য অপরিসীম।

'মন্ত্রশক্তি' নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় রচিত পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক। প্রকাশক বড়াল প্রকাশনী, ৩৬/৫ বাংলা বাজার ঢাকা-১০০০। প্রকাশনার কাল-প্রথম প্রকাশ একুশের বইমেলা, ফাল্গুন ১৪০৫, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯, নাটকটি ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ৩রা এপ্রিল ত্রিতীর্থ, গোবিন্দ অঞ্চলে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত নাট্যোৎসব উপলক্ষে 'গিরিশমঞ্চে' অভিনীত হয়। এই নাটকে অঙ্গবিভাজন নেই, তবে মোট দশটি দৃশ্য বর্তমান।

অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার খাঁ পুর অঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার অপরিসীম শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তে-ভাগার দাবি নিয়ে নিপীড়িত ভাগচাষী বর্গাদার কৃষকদের মধ্যে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেই পটভূমিকাকে কেন্দ্র করে এই নাটকটি রচিত হয়েছে।

ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের উপর নির্মিত মন্ত্রশক্তি নাটকের

কেন্দ্রীয় চরিত্র যশোদা এতদ্‌ঞ্চলের ভাগচাষীদের নেতৃত্ব দিয়ে সংঘবদ্ধ করে রাষ্ট্রীয় শক্তি তথা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রতীক সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠে সরব প্রতিবাদ জানিয়েছিল, জোতদারেরা স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে তেভাগা আদায়ের উদ্দেশ্যে উদ্ভূত গণ-আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে ভীষণভাবে মারমুখী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সেই স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনকে পর্যদস্ত করে সংগঠিত গণশক্তি কিভাবে তেভাগা আদায়ের সাফল্য লাভ করেছিল ইতিহাসসম্মত এই ঘটনাকে পরিস্ফুটিত করে তোলাই নাটকটির মূল উপজীব্য বিষয়।

এই নাটকটিতে চরিত্র পরিকল্পনায় নাট্যকার বেশ সুকৌশলে দুটি পক্ষ স্থির করে নিয়ে একটি সসংহত নাট্য-অবয়ব গড়ে তুলেছেন। একটি পক্ষ এই নাটকের কেন্দ্রীয়চরিত্র যশোদা বর্মনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তে-ভাগার দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে রসুল। আমিনা, বিশু, বদন, সিরাজুল, নগেন, রহমত, খালেদ, অমূল্য, কুসুম, বিমল, লোকটা, কালী ডাক্তার, বিরাম, ফুলি, সুধীর, অধিকারী, ওসমান, সুদীন, গাজন, সেপাইগণ প্রভৃতি চরিত্রগুলি সামাজিক শক্তির পক্ষ অবলম্বন করেছে, অপরদিকে প্রশাসনিক পক্ষ অবলম্বন করে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কর্তা দারোগা রজব আলি, মুখুটি, জমিদার, মাখন প্রভৃতি চরিত্র ভূমিকায় চিত্রিত হয়েছে। সে কারণে এই নাটকে দুটি পক্ষের মধ্যে যেমন প্রতিবাদ-প্রতিরোধমূলক সংঘর্ষের উদ্ভব হয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবে দুটি পরস্পর বিরোধী মেরুকরণ স্পষ্টত ক্রিয়াশীল থেকেছে। এর ফলস্বরূপ পরিলক্ষিত হয়েছে যে, তে-ভাগার দাবি পূরণের মন্ত্রে উজ্জীবিত সাধারণ ভাগচাষীরা কেন্দ্রীয় চরিত্র যশোদা বর্মনের দায়িত্বপূর্ণ নেতৃত্বে তাদের উৎপাদিত ফসলের ২/৩ অংশ আদায়ের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণ হয়েছে অর্থাৎ জয় সুনিশ্চিত হয়েছে। অন্যদিকে সাধারণ ভাগচাষী বর্গাদার কৃষকদের গড়ে তোলা চক্রব্যূহে বন্দী হয়ে স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসন অপমানিত ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয়ে ছটফট করতে থাকে। গুড় গুড় শব্দে মাদল, ঢোল বেজে ওঠে, ক্ষীণকণ্ঠে সমবেত সঙ্গীতের সুর শোনা যায় যেন আসন্ন মহাসংগ্রামের ইঙ্গিতবাহী ধ্বনি—

> ‘‘রণে সাজিল রে
> রণডংকা বাজিল রে
> তেভাগা শুরু হইল দেশে।।
> ছুটে আই চাষী ভাই
> সমান সমান মানা নাই
> ফসলের তিনভাগ চাইরে।।
> ... ...

হুংকারে শত্রু পালায় ভ'য়ে
তে ভাগা শুরু হইল দেশে।।"

এই নাটকে অবহেলিত, বঞ্চিত, অভাবী কৃষকদের কাছে তেভাগা আন্দোলনের কল্প-নায়ক চরিত্র সামসের এক আদর্শে নাম, প্রেরণার শক্তি ও তেভাগা অন্দোলনের জ্বলন্ত অগ্নিশিখারূপে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। এবং এই সামসের পক্ষ-প্রতিপক্ষ উভয় মেরুর মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় সূত্র রূপে কাজ করেছে। এই চরিত্রের আদর্শের কথা বলে ভাগচাষী কৃষকদের একত্রিত করে যশোদা সক্রিয়তার সঙ্গে আন্দোলন সংগঠিত করে তোলে। এবং তারাও সামসেরের সাক্ষাৎ লাভে উৎসাহী। অন্যদিকে প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি দারোগাসহ অন্যান্যরা এই সামসেরের অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পরিশেষে কোন সমাধান সূত্র খুঁজে না পেয়ে হয়রান হয়ে পড়ে এবং জোতদারদের ধারণা হয় সামসের এক অতিমানব চরিত্র এবং অধরা। শেষপর্যন্ত দারোগা সাহেব বাধ্য হয়ে যশোদার কাছে এসে সামসেরের অনুসন্ধান পাবার আশায় তাকে তলব করে— ''খবর পাওয়া গেছে আজ রাত সাড়ে বারোটায় সামসের তোমার বাড়িতে ঢুকেছে।" দারোগার প্রশ্নে যশোদা সরব প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে— এই এক কথা শুইনে শুইনে কান পইচে গেইছে দারোগাসাহেব। তিনমাসে কম করে না হলেও শতবার এই কথা জিজ্ঞাসা করিছেন। ''সামসের কাল রাইতে তোমার বাড়িতে ছিল ... সামসের তোমাক খবর পাঠাছে ... সামসের কাল ভাতিন্দায় তোমাক সঙ্গে নিয়ে তেভাগার মিটিন করিছে— সামসেরকে তুমি ছাড়া কেউ চিনে না ...।" সামসের, সামসের, সামসের। এক কথা কতবার— কতবার কমেন দারোগা সাহেব!" (৮ম দৃশ্য) আবার সেই সঙ্গে লক্ষ করা যায় আন্দোলনে সরব পক্ষের চরিত্র রসুলও সামসের সম্বন্ধে জানার জন্য যশোদাকে বলে— (যশোদাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে) 'সামসের কে যশোদাদিদি সামসের সম্বন্ধে নানাভাবে জানার তৌতূহল ও অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা থেকে নাটকের এক চরম Suspense -এর উদ্ভব হয়। এমনকি যশেদা সুকৌশলে রসুলকে সামসের বলে প্রতিপন্ন করে নিজে আড়ালে থেকে যায়। সর্বোপরি এই যশোদার মন্ত্রমুগ্ধ শক্তির প্রভাবে কমল চরিত্রটির মধ্যে এ আমূল পরিবর্তন সাধিত হতে দেখা যায়। রসুল সিঁধেল চোর থেকে গণ আন্দোলনের পরিপূরণে এবং সমষ্টির কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে পবিত্র সৈনিকদের দায়িত্ব পালন করছে, যা অবশ্যই অভাবনীয়। এই বোধে উত্তীর্ণ হয়ে স্ত্রী আমিনাকে সে বোঝাতে চেষ্টা করে বলে .... ''মুইও এ্যাতদিন তাই বুঝতাম। ভাইবতাম তুই, রসিদ, আমি এই নিয়েই বুঝিবার সংসার তিনমনের প্যাট চইললেই হইল, সব কাম শেষ। কিন্তু ভুল আমিনা, ভুল। মোর সংসার বাদে আরও একটা সংসার আছে রে। যি সংসারটার কথা কোনদিন সুই চিত্তা যাবো নাই।" শেষপর্যন্ত রসুল যশোদাদিদির আদেশে তেভাগায় স্বার্থে তার সেনিকোচিত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সে পুলিশ চৌকি থেকে

ছয়টি রাইফেল সিঁধ কেটে চুরি, যা থেকে যশোদা আনন্দে উত্তজানায় বিহ্বল হয়ে পেড়। এরপর সে কাঁপতে কাঁপতে রসুলের পায়ের কাছে আনন্দে কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং রসুলের উদ্দেশ্যে বলে— ''তুই দ্যাবতা রসুর, দ্যাবতা'' (সকলের দিকে তাকিয়ে) তোমরা সব দ্যাবতাকে গড় কর।'' যশোদার এই কথা শুনে সবাই হাত জোড় করে রসুলকে সম্মান জানায়। এরপর যশোদা রসুলকে বলে— ''না, রসুল না। আইজ তুই বিহানে উঠেছিস, সিখানেই গাঁওর কেউ পৌঁছিবা পাইরবে না।'' এই কথা বলে যশোদা রসুলের দায়িত্বভরা কর্তব্য পরিপালনে অভাবনীয় খুশি হয়ে অদৃশ্য বিপ্লবী নায়ক সমসেরকে এই রসুলের মধ্যেই আবিষ্কার করে এবং দারোগার কাছেও রসুলকে সেই বোধে উন্নীত করে তার গৌরব বাড়িয়ে তোলেন। তাই যশোদা দারোগাকে লক্ষ করে বলে— 'ব্যস সামসেরকে পায়া গেছেন যান যান। মাথা গরম কইরে কুন লাভ নাই।'' এইভাবে কেন্দ্রীয় চরিত্র যশোদার ভাবনায় ভাবিত হয়ে এবং তাকে অনুধাবন করে চরিত্রগুলি পরিণামমুখী বিকাশের পথে অগ্রসর হয়েছে এবং এর ফলে সুসংহত নাট্যমুহূর্ত তৈরি হয়েছে। আবার কাহিনীর পরিশীলিত রস, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্ট চমৎকারিত্ব, বাস্তবোচিত চরিত্রায়ন-এ কল্প-নায়ক চরিত্র সামসেরকে কেন্দ্র করে Suspense বা পরিমিত কৌতুকের ব্যবহার ঘটানোর ফলে নাটকীয় রূপ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে দিক থেকে নাটকটির সাহিত্যমূল্য অবশ্য অবিসংবাদিত।

'খারিজ' একটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক। নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের রচিত এই নাটকটি 'নাট্যচিন্তা নাট্যতীর্থ'- নাটক-সংস্কৃতি-সংবাদ ত্রৈমাসিক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশনার ফলে- ১৪০৩ ... এবং নাটকটি প্রণব চক্রবর্তীর পরিচালনায় এবং নির্দেশনায় বালুরঘাট নাট্যতীর্থের 'মন্মথ মঞ্চে' ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে সার্থক মঞ্চরূপ লাভ করে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গে সর্বত্র এই নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীতি হয়েছে।

নাটকটিতে অংক বিভাজন নেই, শুধুমাত্র মোট ৯টি দৃশ্য সংখ্যা লক্ষ করা যায়। এই নাটকে ১৬টি চরিত্র রয়েছে। চরিত্রগুলি: নগেন, লালু, বনমালী, বিনোদ মাস্টার, ঘনশ্যাম, মকবুল, খেঁদ, সুবল, ডাকাত সর্দার, ১ম ডাকাত, ২য় ডাকাত, সুধীর, মাধাই, তুলসী, সুরবালা, ভামনী প্রভৃতি। বনমালী কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে এবং নগেন চরিত্রটি প্রতিনায়ক চরিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য চরিত্রগুলি অপ্রধান চরিত্রের ভূমিকায় চিত্রিত।

চিরায়ত সুদখোর বৃত্তির তথা মহাজনী পন্থায় অমানবিক শোষণক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উদ্ভুত গ্রাম্য সমাজে উদ্ভুত ধনবান আর সেই ধনবানের অর্থনৈতিক দাসত্বের বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্তি বা খারিজ পাওয়াই হল নাটকটির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। এ নাটকের প্রধান চরিত্র তথা নায়ক বনমালী সুদখোর মহাজনী কায়দায় চক্রজাল বিছিয়ে অনৈতিক শোষণ পদ্ধতিতে তার কাছে মজুত তথা

গচ্ছিত ও বন্ধনীকৃত ধনরাশি চিরতরে আত্মসাৎ করার জন্য বনমালী ষড়যন্ত্র করে তারই কৃষিমজুর নগেনকে নকল ডাকাত সাজিয়ে তার বাড়িতে নকল ডাকাতি করান। এই ঘটনায় প্রতিনায়ক নগেন সুযোগের সদ্ব্যব্যবহার করে তখন গ্রামের সব গরীব মানুষের জমি, সোনাদানা, ঘটি-বাটি থেকে শুরু করে শরীর বন্ধক রাখার হিসেবের খাতাটি পর্যন্ত সমস্তকিছু নিজের হাতে রেখে অবৈধ অর্থ পিশাচ বনমালীর তৈরি করা ঋণ জালের ফাঁদ থেকে সবাইকে মুক্তি দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। অপরদিকে বনমালী নিজের তৈরি ফাঁদের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়েছে। মোটকথা এই নাটকটিতে চরিত্রগুলি স্বাভাবিক গতিতে একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়, অথচ কোন চরিত্রের মধ্যেই তেমন কোনো পরিষ্কার অন্তদ্বর্ন্দ্বের গতিবেগ নেই। তবে সব চরিত্রই কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত এবং প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এ নাটকে চরিত্র বনমালী ট্র্যাজিক পরিণতিবহ চরিত্র হিসেবে রূপায়িত হয়েছে, যা তার বক্তব্য থেকেই পরিস্ফুটিত হয়েছে তার বক্তব্যের মধ্যেই—

''তোর দোহাই নাগে নগেনা খাতা নিয়া যাইস না, মোর সর্ব্বনাশ হোবে। মোর ব্যাবাক টাকা জলে যাবে। মোক পথের ভিখারি করিস্ না নগনা।'' অপরদিকে গ্রামের অসহায় গরীব সর্বহারা কৃষিমজুর নগেন, তুলসী প্রভৃতি সকলের জয় সূচিত হয়েছে। সর্বোপরি এই নাটকটির ঘটনাক্রমিক পরিণতি সংঘটিত হয়ে চরিত্রগুলিকেও ঘাত প্রতিমুখর করে তুলেছে। সেহেতু নাটকটির সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য।

'অনিকেত' সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। আশাপূর্ণা দেবীর গল্প অবলম্বনে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় আলোচ্য নাটকটির নাট্যরূপ দিয়েছেন। প্রকাশক 'বহুরূপী' সংখ্যা ১৭, লোয়ার রেঞ্জ, কলকাতা-১৭, সম্পাদক কুমার রায়। প্রকাশনার ফলে অনুল্লিখিত নাটকটি অভিনীত হয়— ত্রিতীর্থ, 'গোবিন্দ অঙ্গনে ২৫ শে এপ্রিল, ১৯৯০ খ্রি:। একাডেমীতে চেতনার অষ্টাদশ বর্ষে আমন্ত্রিত হয়ে অভিনীত হবে, ২২ নভেম্বর ১৯৯০ খ্রি:। এরপর রবীন্দ্রভবনে (চন্দন নগর) ক্লাসিক (চন্দন নগর) আমন্ত্রিত হয়ে অভিনীত হয়, ২৩ নভেম্বর ১৯৯০ খ্রি:।

এই নাটকটি অঙ্ক বিভাজন নেই, তবে চারটি দৃশ্য সংখ্যা বর্তমান। নাটকটিতে চরিত্র সংখ্যা নয়টি— মনোরমা, প্রিয়তোষ, দেবুকাকা, রাণা, রুচি, সুগত, অদিতি, বাবান, মুন্নি প্রভৃতি। প্রধান চরিত্রে মনোরমা, সহপ্রধান চরিত্রে দেবুকাকা এবং পার্শ্বচরিত্র গুলি হল প্রিয়তোষ, রাণা, রুচিরা, সুগত অদিতি, বাবান, মুন্নি প্রভৃতি। প্রতিকী পাশ্বচরিত্র রূপে আধুনিক সমাজ এবং আধুনিক যন্ত্রনির্ভর শিক্ষা পরিবেশ।

সমাজব্যবস্থায় সামাজিক প্রথাসিদ্ধ তথা চিরায়ত সমাজ-স্বীকৃত পারিবারিক বন্ধন কতটা

পারিবারিক তথা সামাজিক তকমা-নিষিদ্ধ মানবিক স্নেহ প্রেম-প্রীতির সম্পর্ককে গ্রহণ করে নিতে পারে তার একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাই হল নাটকটির মূলভাব (Idea) বা উপজীব্য বিষয়। নাট্যকার এ নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র মনোরমার মনোজগতের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার বা Psyco complex -এর বাস্তব সম্মত রূপ উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। বাড়ির কর্তা প্রিয়তোষ মারা গেলে গৃহকর্তার দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই দেবু, সে এ বাড়িতে তিরিশটি বছর থেকে গেছেন। এই দেবুর সঙ্গে গিন্নি মনোরমার নিবিড় সখ্যতার সম্পর্ক স্থাপন হয়। এবং সে তার ভালোবাসা ও ব্যক্তিত্বের মহিমায় সবার আপন হয়ে উঠল। কিন্তু বাড়ির কর্তা মারো যাওয়ায় একদিন হঠাৎ মা প্রশ্ন তুললেন, বাড়িতে আশ্রিত দেবু এবার কোথায় থাকবেন? মায়ের এই সংশয়টাকে সবাই প্রথমে কুসংস্কার ভেবে গুরুত্ব দিতে না চাইলেও তাদের মনেও সন্দেহে দানা বাঁধে যখন তারা জানতে পারেন যে, কেন মা দেবুকাকার সঙ্গে এ বাড়িতে থাকতে চাইছেন না? আবার এটাও চাইছেন দেবুকাকা যেন কাছাকাছি থাকে।

ঘটনার এইরূপ পরিস্থিতিতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটি পরিবারের মধ্যে সংকট দেখা দেয় এই বোধ থেকে যে, তাহলে দুজনের মধ্যে কী কোন সম্পর্ক আছে, যা এই মুহূর্তে বাইরের মানুষের কাছে নিন্দনীয় হয়ে উঠতে পারে? এছাড়াও বিধবা হওয়ার পর মনোরমা লোকভয়ে তা আর চাইছে না— এই সংকট গভীরে প্রবেশ করে ছেলের বউ অদিতি এবং রুচির বর সুগতর মধ্যে। অদিতির মনে এই বিশ্বাস জেগে ওঠে যে, সম্পর্কটা নারী-পুরুষের সহজাত। তাই হয়তো তিনি এতকাল পরও সবার সামনে ভয়ে ব্যক্ত করতে অসমর্থ হয়েছেন। অপর দিকে সুগতও আপন সিদ্ধান্তে অটল থেকেছেন। তার মনেও প্রশ্ন জেগেছে এইভাবে যে, শাশুড়ি মাতা মনোরমাই দেবুকাকাকে বিয়ে করে সংসারী হতে দেয়নি, চাকরি করতে দেয়নি এ কারণে তাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যায়। মোটকথা এ কাজটা তিনি ভালো করেননি এবং সমর্থনযোগ্য নয়। এই অবস্থায় অদিতি ও সুগতও মনের দিক থেকে দ্বন্দ্ব-সংকটে ভুগতে থাকে অদিতি এবং সুগতর মনোজগতের এই ধারণা ধীরে ধীরে রাণা ও রুচির মনে প্রবেশ করে সংক্রামিত হতে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে মা মনোরমার প্রতি রাণা ও রুচির মনে পবিত্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার চেয়ে বরং প্রবলতর সন্দেহ এবং ঘৃণা জেগে ওঠায় তারা গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে এবং তাদের বিপন্নতা কুরে খেতে থাকে। আবার এতকাল দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত 'দেবুকা' সম্বন্ধে একটা 'অবাঞ্ছিত মানুষ'-এই বোধ তাদের অন্তরে যন্ত্রণার উদ্রেক করায় চরিত্র দুটি বাস্তব ও সূক্ষ্ম ট্র্যাজিক পরিণতিবহ চরিত্র হয়ে ওঠে।

এই অবস্থায় রাত যত গভীর হয় সান্ন্যাল বাড়ির দুটি মানুষ, মা মনোরমা ও দেবুকাকার

মধ্যে ঘটনার নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আবর্তিত হয়ে এক গভীরতর সঙ্কট ও চরম অন্তর্দ্বন্দ্বের মূর্ণাবর্তে নিখুঁত জীবন্ত চরিত্র ও ট্র্যাজিক রসবাহী চরিত্রে পরিণতি লাভ করে। এর ফলে নাটকটির সমগ্র বৃত্তায়নের মধ্যে সার্থক নাট্যমুহূর্ত তৈরি হয়েছে।

এই নাটকের কাহিনীর পরিণতি ভীষণ করুণ ও পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে এবং ঘটনার টানাপোড়েনে প্রতিটি চরিত্রের ট্যাজিক পরিণতি ঘটে। এবং সেই সঙ্গে এ নাটকের আবেদন ভীষণ মর্মস্পর্শী সুতরাং নাটকটির সাহিত্য মূল্য অপরিসীম।

'পত্রশুদ্ধি' হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের লেখা মৌলিক সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাটকটি ত্রিতীর্থ গোবিন্দ অঙ্গন মঞ্চে ২৬ শে আগস্ট ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়। আলোচ্য নাটকটি কোন অঙ্ক বিভাজন নেই। ১১টি দৃশ্যে নাটকটি পরিসমাপ্ত হয়েছে। প্রতিটি দৃশ্য পারস্পরিক কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ। নাটকটিতে চরিত্র সংখ্যা ২৪টি। প্রধান চরিত্র কানন, সহপ্রধান চরিত্রে বলাই, প্রধান পার্শ্বচরিত্ররূপে মধুমিতা এছাড়া সহায়ক চরিত্রসমূহ হালিম, ফতিমা, সরলা, কালী, বৃন্দা, বুধনা, পুটি মনা, আকালু, অধিকারী, একজন, মামা, কুটিলা, জটিলা, ছিদাম, আয়ান, জগা, মদনা, কেরু, সাবি, ধলু, পানু প্রভৃতি।

এই নাটকের মূল প্রতিবাদ্য বিষয় হল গ্রামবাংলার মধ্যবিত্ত সাধারণ পরিবারের অধিকাংশ নারীর পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনার অভাবে শিক্ষা গ্রহণ না করায় তারা নিরক্ষর হয়ে সামাজিক মর্যাদা থেকে পিছিয়ে পড়ে এমনকি এই সব নারীরা তাদের নিরক্ষরতার কারণে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও নানারকম মানসিক হেনস্থার শিকার হয়, তার ফলে তাদের জীবন কতটা দুর্বিসহ, করুণ ও মর্মবিদারক হয়ে ওঠে তারই এক জীবন্ত ও বাস্তব সম্মত চিত্র এই নাটকে নাট্যকার পরিস্ফুটিত করে তুলেছেন।

এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কাননকে ঘিরে নাট্যমুহূর্ত সংগঠিত হয়ে উঠেছে। নারী অশিক্ষিত নিরক্ষর হলেও সমাজে পুরুষের মতোই মন-প্রাণ বিশিষ্ট, তার আবেগ, তার প্রবৃত্তি তার স্বাধীন চিন্তা-চেতনা তার নিজস্ব। তাই কানন স্বাভাবিকভাবে রেশনের দোকানে কর্মচারীর কাজে রত তার স্বামী বলাইকে কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করে একবছর হল প্রত্যেক সপ্তাহে শুক্রবারে একটি করে চিঠি আসে কেন? এটি কার চিঠি? উত্তরে বলাই জানায় এই চিঠি মালিকের মামলা মোকদ্দমা, সাক্ষী সাবুদের বিষয় নিয়ে উকিলের চিঠি। কানন বিস্মিত হয়ে বলাইকে আবার জিজ্ঞেস করে ''মামলা করেছে তোমার মালিক। কিন্তু তোমার নামে চিঠি আসে কেন? আর তুমি সাধারণ কর্মচারী দোকানের কাজ করবা, তোমাকে মামলা মোকদ্দমা দেখা লাগেকেন?''— কাননের এই সব প্রশ্নের উত্তরে বলাই চতুরতার আশ্রয় নিয়ে বলে— ''মালিক একদিন হাত ধরে আনল আমি লেখাপড়া

জানি না, নিরক্ষর মানুষ ও টিপছাইপ সম্বল। আইন কানুনের প্যাঁচ কিছুই বোঝে না জন্য আমার হাত ধরে বেতন ৩০টাকা বাড়িয়ে দিয়ে মামলা মোকদ্দমা দেখার দায়িত্ব দেয়।" এই কথায় কানন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে বলে— ''দেখ তোমার কোমরে যেন দড়ি না পড়ে", তখন বলাই খুব কৌশল করে উত্তর দেয়— ''আমি কাঁচা কাজ করি না। আটঘাট বেঁধে কাজ করি।" এই বলে বলাই কাননকে চিঠিটা পড়তে বলে। উত্তরে কানন জানায়— ''আমি নিরক্ষর মুখ্যসুখ্য মানুষ আমাকে ঠাট্টা করো কেন?"

অপরদিকে কানন লেখাপড়া শিখতে চাইলে বলাই বলে— ''না। মিয়ামানুষ কাম কাজ রান্নাবান্না করবু ব্যাস। লেখাপড়া দিয়ে কি হোবে?" বলাইয়ের লেখাপড়া শেখানোর অনিচ্ছার বিরুদ্ধে কানন যুক্তি দিয়ে বলে— ''ফতিমা চাচী মুখ্য মানুষ, লেখাপড়া জানে না তাই মেয়ের শ্বশুর বাড়ির চিঠি পড়তে না পেড়ে দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কায় উদগ্রীব হয়ে তোমার কাছে চিঠি পড়ানোর জন্য এলো। তাই আমি পড়াশুনা শিখব।" তখন বলাই কাননকে আশ্বস্ত করে বলে, শোনো চিন্তা করো না, চিঠি এলে আমি পড়ে শোনাব। বলাইয়ের একথার উত্তরে কানন বলে— ''তোমার যে চিঠিগুলান আসে মোকতো পড়ে শোনাও না।" কাননের এ কথার উত্তরে বলাই জানায় উকিলের চিঠি শুনে তুমি কি বুঝবে। তবুও কানন জোর পূর্বক শুনতে চায় এবং বলাই কাননকে সাবধান করে বলে যে, গ্রামের দিদিমনি বাড়িতে ঢুকতে না পাবে— এই সব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কাননের মনে স্বামীর প্রতি ভীষণ সন্দেহ দানা বাঁধে এবং এক গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যা তার সত্তাকে গ্রাস করে এবং চরিত্রটি নিখুঁত ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। কানন ডুকরে কেঁদে ওঠে ও তার অন্তরের যন্ত্রণার কথা তার বক্তব্য থেকে পরিস্ফুটিত হয়— ''উঃ রাইত হোবে... রাইত, যিদিনই চিঠি আসবে— সাইজে গুইজে বারাবে— চিঠি ... কী ন্যাকা যাকে তোমার চিঠিতে?"

এইরূপ অবস্থায় কানন ছদ্ম তান্ত্রিক বৃন্দার কাছে যায় তার প্রিয়তম স্বামীর বলাইয়ের সুস্থ স্বভাবিক মনোভাব ফিরিয়ে আনার কামনায়। এও যেন চিরন্তন নারীর স্বামীর প্রতি গভীর টানের উজ্জ্বল নিদর্শন। আবার কানন মেয়ে হয়েও স্বামীর অনৈতিক আচরণের বিপক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে তার মধ্যে শাশ্বত নারীরসত্তার জাগরণ ঘটিয়েছে। তাই সে তার মনোকষ্টের কথা সাক্ষরতা প্রকল্পের দিদিমনি মধুমিতাকে তলব করে বাড়িতে ডেকে এনে সব কিছু খুলে পরিবেশন করে। এবং স্বামীর নামে বাড়িতে আসা চিঠিগুলি দিদিমণিকে দেখায় এবং বলে আজ একবছর হল প্রতি সপ্তাহে একটি করে চিঠি আসে এবং আমাকে বলে উকিলের চিঠি। কাননের এ কথায় মধুমিতা রীতিমত বিস্মিত হয়ে বলে মালিক মামলা করেছে আর উকিল তোমার বরকে চিঠি দিচ্ছে। তিনি সেই চিঠির মধ্যে একটা হাতে নিয়ে বলে উকিল ইন্‌ল্যাণ্ডে চিঠি দিচ্ছে এটা কখনই বিশ্বাসযোগ্য

নয়। তবে চিঠির ঠিকানা দেখে দিদিমনি গম্ভীর হন ও সন্দেহ জাগে। তাই মধুমিতা ইতস্ততঃ করলে কানন তার পায়ে পড়ে অনুরোধ করে বলে দিদিমণি আমি মুখ্যু মানুষ লেখাপড়া জানিনা, অতএব তুমি আমাকে সত্যি কথা বলো।

তখন মধুমিতা বলে— ''তোমার স্বামী তোমাকে সত্য কথা বলেনি। কারণ এ চিঠি উকিলের নয়, হাতের লেখা দেখে মনে হচ্ছে এটি একটি মহিলার চিঠি বা প্রেমপত্র।'' দিদিমণি মধুমিতার কথা শুনে কানন ভীষণ ভাবে ব্যথিত হয়ে বলে— ''এ্যাঁ। আমার সর্বনাশ হইছে। প্রথম যে আমার সন্দেহ হইছে। হা ভগবান মুই কী দোষ করিছি? কেন মোর এই সব্বোনাশ কইরলা? কেন? (প্রবল কান্না)।'' এরপর দিদিমণি কাননকে আশ্বস্ত করে এবং অন্যের চিঠি পড়া অন্যায়, অভদ্রতা হবে বলে উঠতে চাইলে একদিকে সে চিরকালের দুর্বলা নারীসত্তাকে উজ্জীবিত করে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দিদিমণিকে স্বামীর চিঠি পড়ার জন্য অনুমতি দিয়ে বলে কোন অন্যায় হবে না আমার স্বামীর চিঠি তুমি পড়ো। তখন দিদিমণি চিঠি পড়লে একটা বিষয় পরিষ্কার হয় যে, বলাই নিরক্ষর স্ত্রী কাননকে ফাঁকি দিয়ে কখনো কখনো মিথ্যা বা ভুল বুঝিয়ে অর্থাৎ কাননের নিরক্ষরতার সুযোগে তাকে দুর্বল ভেবে ঠকিয়ে সরলা নামে একটি বিধবা শিক্ষিত মেয়ের সঙ্গে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হয়। মোটকথা বলাই মনের দিক থেকে চেয়েছিল একটি শিক্ষিত মেয়ে, যা শুনে কানন ভীষণভাবে মর্মাহত হয়ে পড়ে। অপরদিকে সে দিদিমণির কথা মতো সচেতন হয়ে সুকৌশলে স্বামীর গৃহে অনুপস্থিত থাকার সময়ে পড়াশুনে লিখে ফেলে। এবং দিদিমণির নির্দেশ মতো স্বামীর মন বোঝার জন্য বলাইয়ের নামে একটি চিঠি লেখে। এরপর বলাই ইতি তোমার প্রেমমুগ্ধ 'ম' উক্ত চিঠি পেয়ে অন্তরের দিক থেকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে তার মনোজগতে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। এই দুই দিকের বিশেষ ভূমিকার মধ্য দিয়ে চরিত্রটি সার্থক নাট্যকৃতির পরিচয় বহন করেছে। অন্যদিকে বলাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে 'ম' খুঁজে বেড়ায়— মনা, মদনা, মানিক, প্রভৃতি নামে গ্রামের যুবকদেরকে। শেষপর্যন্ত সে কোন উপায় না পেয়ে গ্রামের মহন্তের দোকানের কর্মচারী মনাকে সন্দেহ করে এবং মনার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে বলে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে বলে তবুও সন্দেহ দূরীভূত না হওয়ায় গ্রামে অনুষ্ঠিত যাত্রাদলের মদনের সঙ্গে দেখা করে। তখন মদন বলাইকে বলে বলাই তুমি তো যাত্রা থিয়েটার বিশেষ পছন্দ করো না তবে এলে কেন? এ কথার উত্তরে বলাই জানায় দোলের দিনে তোমাদের 'মানভঞ্জন' পালা আমাকে ভালোলেগেছে। বলাই সব কথা শুনার পর মদন তালপুকুরের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে এবং বলাইয়ের মনে সন্দেহ প্রবলতর হয় ইতিমধ্যে আর একটি চিঠিতে তালপুকুর ঠিকানা দেখে ঘটনার হ্যাস্তন্যাস্ত করার জন্য সে গ্রামের তালপুকুরে গিয়ে যখন দূরাগত নারীকণ্ঠে গান শুনে ঝোপের আড়ালে লুকাতে যায় তখন ভীষণ আহত হয়—

এই সব ঘটনার ক্রিয়া প্রতিক্রয়ার মধ্য দিয়ে বলাইয়ের মনোস্তাত্ত্বিক জগতের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ বলাইয়ের চরিত্রে স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার নমুনা পরিস্ফুটিত হয়েছে। এবং সহ প্রধান চরিত্র হিসেবে যথার্থ নাটকীয় হয়ে উঠেছে।

মধুমিতা চরিত্রটি সমাজ-মানসিকতার দিক থেকে একটি নিখুঁত ও বাস্তব চরিত্র এবং বৃন্দাকালী চরিত্র দুটি চিরায়ত ভণ্ড তান্ত্রিক ও সুযোগ সন্ধানী চরিত্রটি একটি type character রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে। নাটকটির চরিত্রগুলি কেন্দ্রীয় ভাবমুখী এবং জীবন্ত। কাননের নিরক্ষরতার সুযোগে স্বামী বলাই বিপথগামী হয়ে কাননকে নানাভাবে হেনস্থ করলেও সে সামাজিক দিক দিয়ে সচেতন না হয়ে ওঠে ও শিক্ষা গ্রহণ করে যথার্থ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে প্রকৃত স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে স্বামীকে শুধরে সঠিক পথে নিয়ে এসে নারীত্বের মর্যদাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন— এই দিক দিয়ে নাটকটির ভাব ও ভাবনা রসিক পাঠক— দর্শকদের হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। সে কারণে নাটকটির সাহিত্যমূল্য প্রশংসাতীত।

'গণেশ গাথা' নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের লেখা মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। এটি একটি সামাজিক নাটক। কালিয়াগঞ্জের বিচিত্রা নাট্যসংস্থার প্রযোজনায় ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে 'নজমু নাট্যনিকেতন' (কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর) মঞ্চে স্বয়ং নাট্যকারের পরিচালনা ও নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়ে যথেষ্ট মঞ্চসাফল্য লাভ করে।

নাটকটির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় বাংলার গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় তক্‌মাসিদ্ধ কিংবা লালিত ও পোষিত কোন কুসংস্কার চিরায়ত সমাজ স্বীকৃত পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ কোন ব্যক্তি মানুষের জীবনে মূর্ত্তিমান বিভীষিকা রূপে প্রতিপন্ন হলে পরিবার তথা সমাজ জীবনে তার জীবন কতটা দুঃসহ, একাকিত্ত্ব নিঃসঙ্গতায় নিষ্পেষিত হয়, তখন কুসংস্কারেরই সুযোগ নিয়ে সে আসলে কুসংস্কারকেই আঘাত করে— কিন্তু তার আর্থিক চরম উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুসংস্কারের খোলস এই সমাজ তার কাছ থেকে খুলে নেয়— এই রূপ একটি বাস্তব নিদর্শন এই নাটকে প্রকটিত হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য নাটকটিতে কোন অঙ্ক ব্যবস্থা নেই, তবে মোট ১০টি দৃশ্য নাটকের কাহিনী সুবিন্যস্ত ভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

প্রধান চরিত্র গণেশ, প্রতিনায়ক ধানী পোদ্দার, মনা পোদ্দার, নিতাই এবং পার্শ্বচরিত্র , পিসি, গিরি, এছাড়াও সহায়ক চরিত্রগুলি হল— কিভু মোদক, ছিদাম, ভজা, কেরু, রহিম, ১ম মহিলা, মালতি, ১ম ছেলে, ২য় ছেলে, সমবেত নরনারী, সুদাম, বিদা, কালি, জনতা, জগা, গিন্নী, ঝি (যমুনা), বুধা ক্ষিরী, জগত, রাইচরণ, শিবপদ সরকার, সর্বেশ্বর, মহীদুল, রফিক মিঞা প্রভৃতি।

গণেশ এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র—সে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় প্রাচীন সামাজিক বিশ্বাসের দ্বারা লালিত ও পোষিত এক ভয়াবহ ক্ষতিকারক কুসংস্কারের শিকার গ্রস্থ যুবক। তাই তার মুখ দর্শনে গ্রামের এক দোকানদার বিভু মোদক। সকাল বেলা পূজা পার্বণ দিয়ে দোকান খুলে গণেশকে দর্শন করা মন্ত্র প্রাচীন বিশ্বাসের চালিত হয়ে চোখ বুজে গণেশকে তাড়াতে তাড়াতে মুখ বিকৃত করে বলে— ''দেখো দিন। মুস্কিলত পইড়লাম যা যা বাড়িত যা। (একটু পরে) হ্যাঁ গেইছিস?'' এই কথা বলামাত্র তিনি এক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন এবং সারাদিনের ব্যবসা পণ্ড হয়ে যায়— এতে বিব্রত হয়ে বিলে ওঠে— শালা অসত্তা।'' এই প্রাচীন সামাজিক বিশ্বাসগুলি স্তরভেদে প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে প্রেথিত হয়। তাই এই গ্রামের যুবক কেরুও তার একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে বলে — ''অর মুখ দর্শন কইরলে কেছু না কেছু এটা হোবেই পার পাবুনা। শালার শনির দৃষ্টি।'' গ্রামের একটি মন্দিরের পূজা দিতে আসা গ্রামের মহিলারাও গণেশকে দেখামাত্র চোখ বোজে। এমনকি গ্রামে ডাংগুলি খেলায় মত্ত শিশুদের গুটি হারিয়ে গিয়ে তারা যখন গুটি খোজার ব্যস্ত এমন সময় ১ম ছেলেটি গণেশকে দেখেই চোখ বন্ধ করে রাখে এবং যে তার বন্ধুকে বলে— ''এই সুবল চোখে বন্ধ কর, চোখ বন্ধ কর— আসত্তা''— এই সব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে গণেশ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে এবং সে এক দুঃসহ জীবন কাটায় একাকিত্বে ও নিঃসঙ্গ হয়ে। মোটকথা গ্রামে সকলে তাকে 'দূর ছেই' করে এবং সকলের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় ভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, সে 'অযাত্তা', 'কুসাইত', যার ফলস্বরূপ সে গ্রামের কোনবাড়িতে কাজ না পেয়ে সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়ে জীবন অতিবাহিত করে এবং সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত কুসংস্কারের মোড়কে অতিষ্ঠ হয়ে তার মধ্যে এক গভীর সংকট তৈরী হওয়ার ফলে এই চরিত্রচিত্রনাট্য ক্রিয়া দ্বন্দ্ব সংঘাতে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

অপরদিকে গণেশ সমাজের চরম বিভীষিকাময় কুসংস্কারের যথার্থ রূপ প্রত্যক্ষ করে এই এই কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে কুসংস্কারকেই আঘাত করতে শুরু করে সমাজ থেকে তা চিরতরে দূরীভূত করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু গ্রামের সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত অর্থাৎ গ্রামের লোকবিশ্বাস করত অযাত্তা, কুসাইত, অপয়া ইত্যাদি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উপায় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে মূলত: কুসংস্কারকেই প্রতিপন্ন করে তোলার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে বিত্তবান দুই ভাই ধানী পোদ্দার ও মনা পোদ্দার প্রতিনায়ক চরিত্র হয়ে ওঠে। তাই গ্রামের বিত্তবান জোদ্দার সুদিন পোদ্দারের ছোটো ছেলে মনা পোদ্দার পৈতৃক পুকুরের স্বত্ব নিয়ে বড় ভাই ধানী পোদ্দারের নামে মামলা করলে গণেশ জড়িয়ে পড়ে। তখন মনা পোদ্দার এই মামলায় জেতার জন্য ছদ্ম তান্ত্রিক জগার শরণাপন্ন হলে জগা তাকে বলে— ''কোন কিন্তুক নাই কাকা। মোক্ষম ব্যবস্থা। দেবতার কিরপা ফসকাতেও পারে—

কিন্তু গণেশ এক্কিবারে সিদ্ধিদাতা কুসাইত। অর মাথাত্মির নড়চড় নাই। মামলাত তোমার জিৎ হোবেই।" এই কথা শুনে মনা উৎসাহিত হয়ে জগার বিধান মতো গণেশকে টাকা দেয় তার কুসাইত মুখ দাদা ধানী পোদ্দরকে দেখানোর জন্য। অন্যদিকে ধানী পোদ্দারের কাছে মুখ দর্শন করাতে গিয়ে ভাই মনার ফন্দী দাদা ধরে ফেলে এবং সে ও তার ছেলে নিতাই গণেশকে বেশী টাকার প্রস্তাবে প্রলুব্ধ করে ভাই মনার বাড়িতে তার কুসাইত মুখ দর্শনের জন্য পাঠায়— এই রূপ টানাপোড়েনের মধ্যে গণেশ যখন সুযোগ সুবিধা মাফিক টাকা উপার্জন শুরু করে তখন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সহজ সরল জীবন যাপনে বিশ্বাসী পিসি উৎকণ্ঠিত হয়ে গণেশের কাছে এই টাকা উপার্জনের সঠিক কারণ জানতে চায় এবং এর মধ্য দিয়ে পার্শ্বচরিত্র হিসেবে পিসি চরিত্রটি নিখুঁত বাস্তব রূপ ধারণ করে। পিসির প্রশ্নের উত্তরে গণেশ পিসিকে ধমক দিয়ে বলে— ''... কুড়ার ধারি অক্কমা আমি, কমনা গাওর মানুষ। অক্কমা— শালা কাম দিয়া দেখিছে কেউ— যি আমাক অক্কমা কয়? অযাত্তা, অপয়া চৌপর এক কথা শুইনতে শুইনতে ঘিন্না ধরি গেল। ক্যান তুই মোক বাঁচালু? খাওয়ায় দাওয়ায় বড় করে তুললু? ক' ক্যান?" গণেশের এই আক্ষেপ থেকে সমাজে যে তার প্রতি কুসংস্কারের বোঝা আরোপ করেছে তা সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হয় এবং এর বিরুদ্ধে সে তার যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার প্রচেষ্টায় রত হয়ে গণেশ মনা পোদ্দারকে নানাভাবে জিজ্ঞেস করে বলে— ''আপনেরা দু'জনই মোর মুখ দর্শন করিছেন। আপনাদের দু'ভাইয়ের ভিতর যাই জিতবে তার কাছে আমি যাইত— ''উত্তরে মনাবলে— ''হত তাত কি?" তখন গণেশ বলে— ''তে আমি একজনের কাছে সাইত হইলে অপয়া হনু ক্যামন করে—?" গণেশের এই প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পেয়ে মনা বলে— 'মানে?' তখন গণেশ বলে যুক্তিপ্রতিষ্ঠা মনা পোদ্দারকে জানায়— ''না মানে কছি কি আমি তো এটাই মানুষ। আমি একই সাথ সাইত আর কুসাত হমো ক্যামন রকরে।" তখন মনা পোদ্দার গণেশকে বলে তোমার অত কথার জবাব আমি জানি না তবে কাল সকাল পর্যন্ত ধৈর্য্য ধর কারণ কাল সকালে মামলার রায় হলেই বোঝা যাবে তুমি সাইত কি কুসাইত। মোটকথা সমাজের ক্ষতিকারক ও ভয়াবহ প্রশ্রয় দিয়ে গণেশকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আখের গোছানোর জন্য সর্বদাই প্রস্তুত এমনকি আকস্মিক ভাবে গণেশ 'বঙ্গলক্ষ্মী সুপার বাম্পার লটারী খেলার টিকিট কেটে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে সৌভাগ্যবান প্রতিপন্ন হলে আবার দুই বিত্তবান ভাই তাদের কালো সম্পদ রক্ষার জন্য গণেশের লটারীর টাকা ব্যবহার করে সাদা করার জন্য লেলিহান হয়ে ওঠে এবং গণেশকে আবার প্রলোভন দেখিয়ে টিকিট হাতানোর চেষ্টা করে। তাই মনা পোদ্দার, ধানী পোদ্দার ও নিতাই প্রভৃতি চরিত্রগুলি শ্রেণী চরিত্রের নিখুঁত নাট্যরূপ পরিগ্রহ করে— এই নাটকে যা মূর্ত হয়ে উঠেছে। পরিশেষে গণেশ ভাগ্যক্রমে সম্পদশালী হয়ে ওঠায় গ্রামের মানুষ তথা সমাজের ভুল ভাঙ্গে এবং গণেশের

উপর তাদের আরোপিত অযাত্তা, কুসাইত, কামপণ্ড, অক্কমা প্রভৃতি তকমাসিদ্ধ কুসংস্কার দূরীভূত হয়।

নাটকটির কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে গণেশ লটারীর এজেন্টে রফিক মিঞার সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের নির্দয়, নিষ্ঠুর কঠোর ও নিগূঢ় সত্যকে তুলে ধরেছেন তার বক্তব্যে— ''আপনে সময় মতো না আইসলে এই দুই পোদ্দার আমার ড্যানা দু'টা ছিড়ে ফ্যালাত। কেছু কথা সরেনি তারপর যাছি।'' ...

''(গিরির দিকে এগিয়ে যায়) কীরে গিরি দেখলু ট্যাকার জুতাত কুসাইত কেমন সাইত হয়? (গিরি লজ্জায় মাথা নীচু করে, গণেশ মনার কাছে যায়) কী ছোটপোদ্দার সাইত-কুসাইত বলে কেছু নাই ইবার বুঝলা— কিরে কেরু, রাইচরণ তোরা কী কইস? (সর্বেশ্বর প্রস্থানোদ্যোত হয়ে— গণেশ তাকে বলে) কাকা যায়োনা যায়োনা তোমার সাথ মোর কথা আছে। শুনেছি তুমি দোকানটা বিক্রি কইরাবা তে কছি কি দোকানটা মোক দেও। মুই ন্যায্য দাম দিয়ে কিনে নেমো। (সর্বেশ্বর সম্মতি জানায়) ব্যাস আসল কাম হয়া গেল। তে সর্বেশ্বর মিষ্টান্ন ভাণ্ডার গণেশ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার হোবে। (ধানী ও নিতাই প্রস্থানোদ্যোত হয়) এই যি বড় পোদ্দার নিতাইবাবু ইখানে ছোট পোদ্দারও আছেন। আপনেরা গেরামে জোতদার মাণিক্য গণ্যি মানুষ কালো টাকাক সাদা করার হতাশে আপনেরা যা কইরলেন সি কথা মুই গোপন রাখমো চিন্তা কইরবেন না। আর এটা কথা কই কেছু মনোত নেন না। দরকারে অপয়া কুসাইত মাইনষের মুখ দর্শন করা লাগে। কন ঠিক কিনা?'' নাটকটি নিপুণভাবে পরিবেশিত ঘটনার যথাযথ নাট্যবৃত্তায়ন এবং চরিত্র রূপায়নে সার্থক নাট্যানুপ্রয়াস এবং কেন্দ্রীয় ভাবটিরও পরিস্পূর্ণ রূপে বিকশিত হয়েছে। গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রাচীন সামাজিক বিশ্বাসগুলি কুসংস্কার রূপে প্রতিপন্ন হলে তা যে ভয়াবহ হয়ে ব্যক্তি জীবন তথা সমাজজীবনকেও স্তব্ধ করে দেয়— এটিই আলোচ্য নাটকের প্রধান ভাববস্তু এবং কুসংস্কার মুক্ত স্বচ্ছ প্রগতিশীল জীবন এই ভাবনাই চির দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে। নাটকটির আবেদন শাশ্বত মানবিক ও সার্বজনীন সেদিক থেকে নাটকটির সাহিত্যমূল্য অবিসংবাদিত।

'যদি এমন হতো' নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের লেখা সামাজিক একাঙ্ক নাটক। প্রকাশনায় অকপট পত্রিকা, শারদ, ২০০২ খ্রি:, দ্বাদশ বর্ষ, সম্পাদক পার্থসারথী মৈত্র, প্রকাশকাল ১২ই অক্টোবর ২০০২। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে আগস্ট, ত্রিতীর্থের প্রযোজনায় 'গোবিন্দ অঙ্গন মঞ্চে' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

অমূল্য, নগেন, বিশু, ঘোষক (মাস্টার), দুঃখীরাম হালদার, হালিম শেখ, ভজা, দুলা, ছকু প্রভৃতি চরিত্রে সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যমুহূর্ত নাটকটিতে চরিত্র চিত্রণ এবং সূক্ষ্মভাবে শিশুমনোস্তত্ত্বের

প্রকাশের দ্বারা নাট্য পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। কেন্দ্রীয় ঘোষককে (মাস্টার) কেন্দ্র করে অন্যান্য চরিত্রগুলি আবর্তিত হয়ে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে। চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের দক্ষতা সুস্পষ্ট। এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র ঘোষক বা মাস্টার মহাশয় চরিত্রটি উপলব্ধি করেন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শিশুমনের উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষা পদ্ধতির কবলে পড়ে তাদের শৈশবের আনন্দ ফূর্তি হারিয়ে শুধু নিরস শিক্ষা গ্রহণে উদভ্রান্তের মতো এগিয়ে চলেছে এবং তার মধ্যে মানসিক পূর্ণ বিকাশের চেয়ে বিকৃত চিন্তা চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠেছে, যা মানব সভ্যতার ক্ষতিকারক। তাই শিশুমনের পরিপূর্ণ বিকাশে জোরপূর্বক বা আরোপিত শিক্ষা পদ্ধতি কখনই শ্রেয় নই, যা এই নাটকের কোরাসের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে—

সত্যি কথা। সত্যি কথা বলছি ভাই
লেখাপড়া আনন্দ।
শেখার আছে হামার পথ
নেই বাধা বন্দ
কিছু আছে আদ্যিকালের
বুড়ো হদ্দ হদ্দ
বেত আর বকুনীতে করছে লেখা পড়ার শ্রাদ্ধ।
চুলোয় যাক বেত মারা
বকা ঝকা বন্ধ
ভয় নয় ভীতি নয়
থাকুক শুধু আনন্দ।

তাই শিশুদের মনোজগতের চাহিদামাফিক শিক্ষার পথে এগিয়ে আসার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে মাস্টার মশাই তাদের চালিত করে নিখুঁত নাট্যচরিত্রে হিসাবে রূপায়িত হয়েছে। অপরদিকে তার প্রেরণায় উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশু, দুখিরাম হালদার, হালিম শেখ, ভজা,দুলু, ছকু প্রভৃতি চরিত্র তাদের শৈশবের তথা শিশুমনের চিরন্তন চাওয়া পাওয়া বিশেষ করে শুধুই পড়াশুনা নয় তার সঙ্গে খেলাধূলা, আনন্দের বহিঃপ্রকাশ রূপে গান আর খেলাধূলার মধ্যে লেখা পড়া শেখে, চার দেয়ালে খেরা না থেকে খোলামেলা মুক্ত প্রকৃতির মাঝে থেকে শেখে— এই স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক চিন্তা চেনতনা শিশুদের মধ্যে জেগে ওঠে এবং তারা আরোপিত শিক্ষা পদ্ধতির সবরকম প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে খুশিমনে আনন্দে উদ্বেবিলত হয়ে পড়াশুনোয় মনোনিবেশ করে এবং তাদের মনোস্তত্বের খোরাক পরিপূরণে চরিত্রগুলি নিখুঁত বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্ররূপে ফুটে উঠেছে। শিশুদের শিক্ষা

গ্রহণের এই নব অনুভূতির কথা কোরাসে ব্যক্ত হয়েছে—

''ভয়ভীতি দূর করে ইসকুলেতে চলো।
খেলাধূলো করতে করতে লেখাপড়া শেখো।
(আথা) লেখা পড়া শোখে।
একের সংগে এক যোগে দুই হয়ে যায়।
একের থেকে এক গেলে থাকে শূন্য হায়
কেমন মজা? আহা কেমন মজা?
বলতো ভজা। দুটো একে কতো?
জানি জানি খুব জানি হয় সে এপার।''

মোটকথা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরোপিত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান একটি জটিল সমস্যা। তাই শিশুদের মানসিক পরিপূর্ণ বিকাশের সঠিক পথ ভয়ভীতি দূর করে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে খেলাধূলা ও আনন্দের মধ্যে শিক্ষা দানে সকলকে সমবেত ভাবে এগিয়ে আসতে হবে যা নাটকটির মুখ্য প্রতিপাদ্য এবং এখানেই আলোচ্য নাটকটির নাট্যকৃতি ব্যঞ্জনাবহ ও সাহিত্যমূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'প্রজন্মের কাল' অজিতেশ ভট্টাচার্যের লেখা। এটি ৮টি কাব্যনাট্যের একটি সংকলন গ্রন্থ। প্রকাশক-' পুনশ্চ' ৯ এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ। এই সংকলন গ্রন্থে প্রজন্মের কাল, লখিন্দর যুদ্ধে যায়, রাজা একদিন, দ্বিতীয় কণ্ঠ, জাগরণে শয্যা, সমর্পণে যদি, স্বাগত সংলাপ, সূর্যের প্রতিমুখ প্রভৃতি আটটি কাব্যনাট্য বর্তমান।

'প্রজন্মেরকাল' কাব্যনাট্যটিতে বৃদ্ধ, যুবতী, চিকিৎসক— তিনটি চরিত্র। চরিত্রগুলির মধ্যে আবেগ নাটকের স্ফুরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ সংলাপ ও অপরিমিত আবেগ কাব্যনাট্যটির নাট্যরস সংগঠনে ব্যর্থ হয়েছে। 'লখিন্দর যুদ্ধে যায়' এটি দ্বিতীয় কাব্য নাট্য। এখানে পাঁচটি চরিত্র রয়েছে— লখিন্দর, বেহুলা, সনকা, পরিচালক ও নাট্যকার। কাব্যিক উদ্বেলতা এখানে কম প্রকাশ পেয়েছে। কাব্য ও নাটকের যথার্থ সংযোগ হয়নি।

'রাজা একদিন' এটি তৃতীয় কাব্যনাট্য। পাঁচটি চরিত্র রয়েছে— রাজা, দ্বিতীয় কণ্ঠ, কমলা, কোতোয়াল, এই পাঁচটি চরিত্রের সমবায়ে এই কাব্যনাট্যটি সংগঠিত। এখানে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সংগঠন নেই।

দ্বিতীয় কণ্ঠ চতুর্থ কাব্যনাট্য, চারটি চরিত্র— পয়োষ্ণী, বসুধা, অরিজিৎ, সমর্পণ প্রভৃতি। চরিত্রগুলির নাট্যবন্ধনে দুর্বল। নাটক ও কাব্যের মেলবন্ধন দৃঢ় নয়।

'জাগরণে শয্যা' -এটি পঞ্চম কাব্যনাট্য। সুদীপা, অরুণেশ, পত্রলেখা, বিনয়, চারু প্রভৃতি

চরিত্রগুলি এই কাব্যনাট্যটি সংগঠিত করেছে। চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বহীন। 'সমর্পণে যদি' ষষ্ঠ কাব্যনাট্য। কাব্যনাট্যটি দীপান্বিতা, অরিত্র, শশি, অলোকেন্দু — এই চারটি চরিত্র নিয়ে সংগঠিত। চরিত্রগুলি নাট্যগুণে সমৃদ্ধ, প্রধান চরিত্র দীপান্বিতা। চরিত্রটি আশা-হতাশার দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ ও যথাযথ। 'দীপান্বিতা' চরিত্রটি নাট্যকারের দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

'স্বাগত সংলাপ' সাত সংখ্যক কাব্যনাট্য এটি। একটি চরিত্র বিশিষ্ট কাব্যনাট্য। চরিত্রটির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকটিত হয়ে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে সার্থক নাট্যগুণ বর্তমান। এদিক থেকে এই কাব্যনাট্যটির সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য।

'সূর্যের প্রতিমুখ' শেষ অর্থাৎ অষ্টম কাব্যনাট্য। কাব্যনাট্যটি বৈশাখী, দীপাধার, শোভন প্রভৃতি চরিত্র নিয়ে সংগঠিত। চরিত্রগুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র রয়েছে। কাব্যরস এখানে স্বাভাবিক প্রতিটি চরিত্রই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যের আয়োজন যথাযথ রয়েছে। তাই কাব্যনাট্যটির সাহিত্যমূল্য অবিসংবাদিত।

'সানাই' প্রদোষ মিত্রের কাহিনীর সূত্র ধরে নাট্যকার ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি সার্থক প্রকাশনায় একাঙ্ক নাটক। প্রকাশনায় নাট্যচিন্তা নাট্যতীর্থ। নাটক সংস্কৃতি-সংবাদ ত্রৈমাসিক সম্পাদক প্রণব চক্রবর্তী, প্রকাশকাল— এপ্রিল ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ। এই একক অভিনয় সমৃদ্ধ নাটকটি প্রদোষ মিত্রের নির্দেশনায় কলকাতায় 'চেনা অচেনা' আমন্ত্রণে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ৫ই মে একাডেমীতে মঞ্চস্থ হয় এবং যথার্থ মঞ্চসাফল্য লাভ করে। এরপর কলকাতায় নান্দীকারের জাতীয় নাট্যোৎসব ও কল্যাণীতে জাতীয় নাট্যোৎসব আমন্ত্রিত হয়ে বেশ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। এছাড়াও রাম্যের বিভিন্ন স্থানে এবং মুম্বাইতে তিনবার মঞ্চস্থ হয় এছাড়াও কলকাতার নাট্য একাডেমীর শিশুনাট্য মেলায় আমন্ত্রিত নাটকটির প্রধান উপজীব্য বিষয়: আধুনিক কর্মব্যবস্থার যুগে চাকুরীজীবি পিতামাতার কর্ম ব্যস্ততার দরুণ ছোট সানাইদের কীভাবে পিতা মাতার এবং পরিবারের প্রিয়জনদের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে অধিকাংশ সময় গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে ঘরবন্দী নিঃসঙ্গ অবস্থায় সময় কাটাতে হয়— পরিবর্তন শীল সমাজব্যবস্থায় উদ্ভূত এই সামাজিক সমস্যার বাস্তবচিত্র নাট্যকার এই নাটকে নিপুণভাবে পরিস্ফুটিত করে তুলেছেন।

নাটকটিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র সানাই, পার্শ্বচরিত্র পিতামাতা, সহপাঠী, নির্বাক পুতুলগুলি এবং প্রতিপার্শ্ব চরিত্র আধুনিক সমাজ কাঠামোয় একক পরিবার চেতনা এবং যান্ত্রিক পরিবেশের প্রভাব।

এই নাটকে Key character সানাইয়ের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূক্ষ্মতর ও জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকটিত হয়েছে। বর্তমান সমাজ কাঠামোয় আত্মকেন্দ্রিক জীবনবোধ, স্বার্থপরতা ও সর্বোপরি ভোগবাদ মাথা চড়া দেওয়ার ফলে একক পরিবার কেন্দ্রিক চিন্তা চেতনায় সুখ খোঁজার

স্পৃথা প্রতিটি ব্যক্তি সত্তার মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এমনকি পরিবার, সমাজ রাষ্ট্র সব কিছু থেকে দায়বদ্ধতা গুটিয়ে নিয়ে আত্মমুখীনতার বশীভূত হয়ে জীবন যাপন যেন আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রোথিত হয়েছে। তাই পারস্পরিক সহানুভূতি, ভাববিনিময় দায়িত্ববোধ কর্তব্যবোধ, আবেগ সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষ নিজের খুশি ও খেয়ালমাফিক জীবন যাপনে রত। এরফলে নতুন নতুন সমস্যা উদ্ভূত হয়ে মানুষের সুস্থু স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন ভাবনাকে গ্রাস করছে। তাই এই নাটকে আধুনিক কর্ম ব্যস্ততার যুগে কর্মরত পিতামাতার একমাত্র কন্যা সন্তান সানাইরা পরিবার খোপের মতো বহুতল বিশিষ্ট ফ্ল্যাটে সঙ্গীহীন স্নেহ-মুখ-আনন্দহীন আশ্রয়ে আবদ্ধ থেকে বড় হয়ে ওঠার ইঁদুর সুলভ দৌড়ে হাপিয়ে ওঠে— এমনকি এদের কোন শৈশব নৈই— খেলার উঠোন-আঙ্গিনা নেই, আব্দার-বায়না সহ্য করার ঠাকুমা-পিসিমা নেই বরং আছে ভারি স্কুলের ব্যাগ, বই, খাতা ইত্যাদি সবসময় তাদের মনোজগতে একটি যথেষ্ট প্রভাব ক্রিয়াশীল রাখে— এই সব ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অতিষ্ট হয়ে সানাইয়ের মধ্যে প্রবল উৎকণ্ঠা জেগে ওঠে এবং সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিল বাতাবরণে নিষ্পেষিত হয়ে থাকে। অপরদিকে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী-জীবন যাপনে অভাবনীয় অসহায়তা, নিঃসঙ্গতা তাকে কুড়ে কুড়ে গ্রাস করে— স্কুলের কোন বন্ধুর কাকুর সঙ্গে এয়ারপোর্টে বেড়াতে যাওয়ায় তার হিংসা— দৈনন্দিন জীবন চর্যার প্রতিটি পদক্ষেপে মার শাসনও গর্জনের ফলে তার মধ্যে প্রকট দ্বন্দ্ব-সংঘাত মুখর পরিস্থিতির উদ্রেক হয়, যা এই চরিত্রটিকে নাট্যগুণে মৃদ্ধ করে তুলেছে।

আবার সানাই-এর মনোজগতে কখনো কখনো বাস্তবতা ও কল্পনা-প্রবণতার দোলাচলতাকে সে বড়ই দ্বিধান্বিত সেহেতু উড়ো জাহাজের উড়ে চলার শব্দ শুনলে নতুনা মেঘের গর্জন শুনলে সে বারবার জানালার দিকে ছুটে যায়— টেলিফোনে ডেকে ডেকে বড়দের কাছ থেকে গল্প শুনতে চায় তখন অধিকাংশ সময় বড়দের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অভিমান ভরে ঘরে বসে পুতুলের সঙ্গে গল্প করে, গল্প বলায় ঘট মন থেকে চাইলেই সে বাইরের মুক্ত আকাশের অভিমুখে বেরুতে পারে না— মুক্ত আকাশ। মুক্ত বাতাস, মুক্ত আলো সর্বোপরি মুক্ত প্রকৃতি তাকে ডাকে কিন্তু সে পরিবারের কোনঠাসা জীবন যাপনের চক্রব্যুহে বন্দী— এইসব ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে যথার্থ নাট্যক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বিপরীতে সানাই -এর পিতামাতার কর্মব্যস্ততার দরুণ বাধ্য হয়ে সানাই-এর সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের প্রতিবন্ধকতা গড়ে তোলা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় যন্ত্রনির্ভর যান্ত্রিক সভ্যতার কুপ্রভাব আবেগ ... দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে এই দুইয়ের বিশিষ্টতায় প্রতিপার্শ্ব চরিত্র এই নাটকে নিখুঁত বাস্তব ও জীবন্ত রূপে প্রতিভাত হয়েছে। সর্বোপরি নাট্যরস সংগঠনে যথেষ্ট সার্থকতা লাভ থাকায় এ নাটকটির নাট্যকৃতির

মূল্য চিরন্তন আবেদনমুখী এবং স্থাপত্য মূল্য অপরিসীম।

'জলপোকা' নাট্যকার জিষ্ণু নিয়োগী লেখা পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাট্যশ্রেণীর বিভাজন সাপেক্ষে একটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাটকটি প্রকাশিত হয়নি। তবে তূণীর নাট্যসংস্থার প্রযোজনায় এবং মোহর চক্রবর্তীর নির্দেশনায় ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে বালুরঘাট নাট্যমন্দির মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়।

জলপোকা নাটকটির দৃশ্য সংখ্যা আটটি। চরিত্র সংখ্যা ১৪টি।— মুরারী, হারান, বিশু, কৌশল্যা, যতুন, গোবিন্দ, বিধান, অনাথ, অমল, নৃপেন, সমর, মলিনা, দীপা, শ্যামলী প্রভৃতি ছাড়াও রয়েছে গ্রামবাসী। এ নাটকে প্রধান চরিত্র মুরারী সহপ্রধান চরিত্র হারান এবং পাশ্চচরিত্র বিশু ও কৌশল্যা। এছাড়াও সহায়ক চরিত্র যতুন গোবিন্দ, বিধান, অনাথ, অমল, নৃপেন সমর, মলিনা, দীপা শ্যামলী গ্রামবাসী। এ নাটকে কাহিনী অপেক্ষা বিচ্ছিন্ন ঘটনা সাপেক্ষে চরিত্রপ্রধান হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রধান নদী আত্রেয়ীকে কেন্দ্র করে জেলে মাঝিদের পারিবারিক আর্থিক নির্ভরতা। অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-বেদনার নিদারুণ করুণ কাহিনীর বাতাবরণে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা উপস্থাপিত হয়ে আলোচ্য নাটকে নাট্যমুহূর্ত সংগঠিত হয়েছে। মুরারী শারীরিক দিক দিয়ে বার্ধক্যে পৌঁছালেও অতীতে তিনি আত্রেয়ী নদীতে বারো বছর মাছ সংগ্রহ করে সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করতেন কিন্তু কালের বিবর্তনে আত্রেয়ী নাব্যতা হারিয়ে খরস্রোতা হয়ে পড়ায় মুরারীর পরিবারের অভাব প্রবলভাবে চাড়া দেওয়ায় আর্থিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে এবং দারুণ বেদনাকারক পরিস্থিতির শিকার হয়। এই আর্থিক করুণ অবস্থার কথা যে আক্ষেপ ভরে প্রকাশ করে বলে— ''হারানরে নদীভারে দ্যাখছাও। কেমন মরা সাপের মতো পইর‍্যা থাকে না? নরেওনা চরেওনা, অথচো এই আত্রাই মা আমার কতুজনের প্যাটের ক্ষুধা মিটাইছে কও?'' আবার সে বলে ওঠে— 'এই ...নদীতে জল নাই-জলে মাছ নাই। অ্যাজ-জল পুকা সেও জলডায় বসে না এরপর আমাগরের ছেলে পুলেরা কি কইরবে? ওর থানেই যতো ভয় হয় বুইঝালা না'' এই কথার মধ্য দিয়ে মুরারীর মধ্যে অভাবতাড়িত হয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং আরেকটি চরিত্র নিখুঁত বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র রূপে ফুটে উঠেছে। মুরারীর আর্থিক অভাবঅনটনের কবলে পড়ে নিষ্পেষিত হয় তার ছেলে বিশু ও পুত্রবধূ কৌশল্যা। সম্প্রদায়গত জীবিকার দুর্দিনে পড়ে বিশু উপার্জনহীন হয়ে পড়ে ভবঘুরে কর্মহীন চরিত্রে পরিণত হয়। (হারান বাধ্য হয়ে জাতিগত পেশা ছেড়ে দিয়ে চালকলে কাজ নেয়।) অপরদিকে কৌশল্যা গৃহের আর্থিক আস্বচ্ছলতার কারণে প্রতিযোগী দোকানদার, যতুনের প্রলোভনে পড়ে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে সংসার চালায় অর্থাৎ অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। এ কারণেই হয়তো এই খারাপ পথে ধাবিত হয়ে চরিত্রটি বাস্তবতা লাভ করে। জাতিগত পেশা ছেড়ে দিয়ে চালকলে কাজ নেয়। নদী নাব্যতা হারানোর ফলে হারান দারিদ্রক্লিষ্ট অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য তার

পেশা পরিবর্তিত করা কথা গ্রামের মাথা বৃদ্ধ মুরারীর কাছে বিনীত ভাবে বলেন—''কেন্ কাহা, আমিতো এহন মিলোৎ কাম করি। ...''

হারানেরা জলে ভাসমান সুকঠিন জীবনযাত্রার মধ্যে বাঁচার সুখ, ভবিষ্যতের ভালো কিছুতে উত্তরণের স্বপ্ন ফেলে। কিন্তু তাদের সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণতি লাভ করেনি, কারণ নদীর জলসংকটে সম্প্রদায়গত জীবিকা ও পেশা হারিয়ে তারা হাতগুটে বাড়িতে বসে থাকে, আবার কখনো বাধ্য হয়ে অন্য কাজ করে অতি কষ্টে বেঁচে থাকে— এই করুণ ও হতাশাময় অবস্থা যেন তাদের নিয়তি— এই টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে হারানোর মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত মুখর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং চরিত্র হিসেবে নাটকীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। পক্ষান্তরে মুরারী সংসার ও গ্রামের জেলে সম্প্রদায়ের মানুষদের সকলের মুখ স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্ন দেখেছিল কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত না হওয়া করুণ নিয়তির শিকার হয়ে বাধ্য হয়ে নদী ঘাটের দহে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে জলপোকার মতো ভেসে থাকে। এরফলে চরিত্রটি ট্র্যাজিক পরিণতি সহ চরিত্ররূপে প্রকটিত হয়। অন্যান্য চরিত্রগুলি শ্যামলী মলিনা চরিত্রগুলিও কেন্দ্রীয় ভাবমনীষা ও জীবন্ত। আধুনিক সুকঠিন আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত সাধারণ অসহায় মানুষেরা সম্প্রদায়গত পেশা হারিয়ে বাধ্য হয়ে নানা পেশা অবলম্বন করে অতি কষ্টে কায়ক্লেশে জীবন-যাপন করে বেঁচে আছেন এটিই নাটকের অন্তর্নিহিত মূলভাব। এবং নাটকটির আবেদন চিরন্তন মানবিক ও হৃদয়গ্রাহী। সেদিক থেকে নাটকটির সাহিত্যকৃতি— উপেক্ষনীয় নয়।